2002

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ☐ ১৯তম সংখ্যা

১৫ এপ্রিল, ২০০২ ইসাব্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

এক নজরে আহমদনগর জামাতের ২০তম সালানা জলসা ২০০২

বক্তৃতাদানকারীদের কয়েকজন

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

এ কে রেজাউল করীম

আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক

হাফেজ মৌঃ সেকান্দর আলী

মাওলানা বশীরুর রহমান

মাওলানা সালেহ আহমদ

পুরুষ প্যান্ডেলের একাংশ

মহিলা প্যান্ডেলের একাংশ

এ মুহূর্তে আদর্শ জননীর বেশি প্রয়োজন

জাতিকে সুন্দরভাবে গড়তে হলে আদর্শ জননীর প্রয়োজন এ মুহূর্তে অনস্বীকার্য। যে মা ফোটা ফোটা রক্তসম দুগ্ধ দিয়ে একটি কচি ক্ষুদ্র শিশুকে একদিন বড় করে তোলেন সেই মায়ের প্রতিটি মুহূর্তের স্নেহমাখা উপদেশ-নির্দেশই পারে একটি সন্তানের চরিত্রকে মাধুর্যপূর্ণ ও মহিমাময় করে গড়ে তুলতে। এ বিষয়টি সবচে' অধিক উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের প্রিয়-নবী বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। তাই তাঁর পবিত্র মুখে ধ্বনিত হয়েছিলো- **মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত**। মা যদি স্বয়ং বেহেশ্‌তি না হন তাহলে সন্তানের বেহেশ্‌ত ঐ মায়ের পায়ের নীচে কি করে হতে পারে?

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী বলেছেন- **যদি তুমি ৫০ শতাংশ মহিলার সংশোধন করে নাও তাহলে ইসলামের উন্নতি সাধন হবে** (আল আযহার লে যাওয়াতিল খেমার, পৃষ্ঠা ৩৯০)। আজকের আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা যে অবক্ষয়ের করাল গ্রাসে আক্রান্ত তা অস্বীকার করার জো নেই। এ অবক্ষয়ে আক্রান্ত সমাজকে পথের দিশা সঠিকভাবে দেখাতে পারেন আদর্শ জননীরা। সুতরাং হুযূর (রাঃ)-এর পবিত্র বাণী অনুযায়ী কমপক্ষে অর্ধেক নারী সমাজও যদি বেহেশ্‌তি হন তাহলে একটা সুশীল সমাজ গঠন করা কোন অসম্ভব বিষয় নয়।

আমরা বাংলাদেশের আহমদীরা স্বাভাবিকভাবেই এ দেশের জনগোষ্ঠীর একটি অংশ। সুতরাং এ অবক্ষয়ের পাথারে যে আমাদের কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী হাবুডুবু খাবে না বা খাচ্ছে না তা আমরা এখনও জোর দিয়ে বলতে পারি না। আমাদের কিশোর-যুবকদের সঠিকভাবে তালীম তরবিয়ত দেবার জন্যে আমাদের মহিলা সংগঠন-লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র দায়িত্বকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই; বরং এ সংগঠনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এটাই। আমরা নিজেরা যতই ভালো বলে দাবী করি না কেন আমাদের ফল-স্বরূপ সন্তানরা যদি প্রকৃত ইসলাম ও আহমদীয়তের আলোকে পুরোপুরি আলোকিত না হয়ে গড়ে ওঠে তাহলে আমাদের দাবী হবে বাক-সর্বস্ব। সুতরাং আমাদের বোনদেরকে বলবো, শিথিলতা যা হয়ে গেছে ভুলে যান। সামনে আমরা যেন আর শৈথিল্য প্রদর্শন না করি। আমরা যেন দোয়ার সাথে আমাদের সন্তান-সন্ততিকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে কুরআন, সুন্নাহ্ ও আহমদীয়তের আলোকে সর্বাত্মক চেষ্টায় নিয়োজিত হই। আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই তাহলে আমরা যেমন আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী হবো তেমনি আমাদের সন্তান-সন্ততির নিকটও যে অপরাধী সাব্যস্ত হবো তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ॥ ১৯তম সংখ্যা

২ বৈশাখ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ১ সফর ১৪২৩ হিঃ কাঃ
১৫ শাহাদত ১৩৮১ হিঃ শাঃ ১৫ এপ্রিল ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	–	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@ bol-online.com

সম্পাদকীয়

গুরু-মারা বিদ্যা !

কাশ্মীরে হযরত ঈসা (আঃ) বা যীশুখৃষ্টের কবর সম্বন্ধে একজন মার্কিন মহিলা গবেষক সুজন মারি ওলসনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সাবেক রাষ্ট্রদূত ও কলামিষ্ট আখতার-উল-আলম সাহেবের "কাশ্মীরের কিস্‌সা" ভিন্ন প্রেক্ষিত শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ছেপেছেন দৈনিক সংগ্রাম তার ২৩-৩-২০০২ তারিখের ২৭তম বর্ষপূর্তি সংখ্যায়। জনাব আখতার-উল-আলম তেমন নতুন কিছু বলেন নি। যা বলেছেন তা তাঁর "শেষ নবী (সঃ)" পুস্তকের "কাশ্মীরের কিস্‌সা" অধ্যায়ের পুনরুক্তি মাত্র। তিনি যেসব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন তা খুবই নিম্নমানের। যেখানে কুরআনের দু'ডজনেরও বেশি আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রমাণ করেছে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সেখানে তিনি সেগুলোর সম্বন্ধে কোন বক্তব্য না রেখে কয়েকটি নিম্নমানের প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। আমাদের পুস্তকাদিতে এ সম্বন্ধেও বহু কথা বলা হয়েছে তাই আমরা তাঁর উক্তির দিকে না গিয়ে দৈনিক সংগ্রামের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। জনাব আলমের এ প্রসঙ্গে আঁতে ঘা লাগার কারণ মনে হয় শতাব্দী কাল পরেও জ্ঞানী- গুণী ও গবেষকরা হযরত মির্যা সাহেবের মতকে স্বীকার করে চলেছেন তা-ই।

সংগ্রাম এ প্রবন্ধটি ছেপেছেন কোন্ মহৎ উদ্দেশ্যে? তাহলে কি আমরা বুঝবো যে, সংগ্রামও ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকার প্রসঙ্গে আখতার-উল-আলমের সাথে একমত। যদি একমত হয়েই থাকেন তাহলে তাদের গুরু মৌলভী মওদূদী সাহেবের নিম্নোক্ত মন্তব্যের প্রতি কী করে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন?

মৌলভী মওদূদী সাহেবের কতিপয় বক্তব্য তো নিম্নরূপ ঃ

(১) ফালাহ্-ই-আর্ম ট্রাষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী কর্তৃক প্রণীত 'তরজমায়ে কুরআন মজিদ'-এর ১৯০ পৃষ্ঠায় সূরাতুল মায়েদার ১১৭ আয়াতের ৫৭নং টীকায় লিখেছেন ঃ

"আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে মাত্র মসীহ ও পবিত্র আত্মাকেই খোদা বানিয়ে খৃষ্টানগণ ক্ষান্ত হয় নি, এ ছাড়া তারা মসীহ্‌র সম্মানীয়া জননী মরিয়মকেও এক স্থায়ী উপাস্যরূপে গণ্য করে বসে। **মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যুর** পর প্রথম তিনশ' বৎসর পর্যন্ত খৃষ্টান জগত এ ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল"। ...

(২) "মসীহ্ (আঃ)-এর জীবিত থাকা এবং সশরীরে আকাশে উত্তোলিত হওয়া নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন নয় এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস জন্মে না" (ইচ্ছাবার বক্তৃতা, ২৮শে মার্চ, ১৯৫১ ঈসাব্দ)

এমন কি দৈনিক সংগ্রাম স্বয়ং এর ২১শে মে, ১৯৯৭ তারিখের "খেলাফত ব্যবস্থা" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লিখেছেন - "বিশ্বের সকল এলাকার মানুষই চায় অন্যায় অবিচার মুক্ত একটি সমাজ ও সমাজ পরিবেশ। কিন্তু মানবজাতির এই কাংখিত অবস্থা ও ন্যায়-বিচার এখন পর্যন্ত পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষ হাতের নাগালের মধ্যে পাচ্ছে না। **হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইন্তেকালের** প্রায় ৬শ বছরের শেষার্ধটি ছিল অন্যায় অবিচারে জর্জরিত ..."।

উপরোক্ত মন্তব্য কি স্ববিরোধি নয়? এটাকে কি গুরুমারা বিদ্যা বললে অতিরিক্ত বলা হবে? সংগ্রামের এ ব্যাপারটি অন্যান্য বিষয়ের মত পাঠকদের কাছে অস্পষ্টই থেকে গেল।

আসলেই তাই

হাদীসে আছে, যে নিজের ভাই-এর জন্যে গর্ত খুঁড়ে তাতে সে নিজেই পড়ে। কথাটা পাকিস্তানের মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো বিশেষ করে জামাতে ইসলামী পাকিস্তানের বেলায় ষোল আনা খাটে। এসব মৌলবাদী দলগুলোর অপচেষ্টায়ই একদিন লারকানার নবাব পুত্র জলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭৪ সনে মৌলিক অধিকার, মানবতা তথা ধর্মীয় মূল্যবোধকে পদ-পিষ্ট করে আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তথাকথিত আইন পাশ করে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে 'নট মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ট' ঘোষণা করে। এরপরে চলে আহমদীদের ওপরে নির্যাতনের ষ্টিম রোলার। দশ বছর পরে যখন দেখা গেলো এ তথাকথিত আইনের বেড়া ডিঙ্গিয়েও পবিত্রাত্মাগণ আহমদীয়ত গ্রহণ করছেন তখন জেনারেল জিয়াউল এক ধাপ এগিয়ে এক ডিক্রী জারী করেন আহমদীদের সম্পূর্ণ মৌলিক অধিকার হরণ করে। এরপরে পাকিস্তানে যা ঘটছে তা সকলের নিকট উন্মুক্ত কিতাবের মত। যে গর্ত আহমদীদের জন্যে খোঁড়া হয়েছিলো তাতে এখন গোটা জাতিই পড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা এতই নাজুক যে, তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে, দেরীতে হলেও পাকিস্তান জামাতে ইসলামী কয়েকটি দাবী তুলেছেন। (পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন ৮, দৈনিক ইনকিলাব ১৭-৩-২০০২)। এর মধ্যে দু'টি নিম্নরূপ ঃ

১। ১৯৭৩ সালের ঐকমত্যের সংবিধান পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে ...।

২। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলগুলোর ওপর থেকে আরোপিত বিধি-নিষেধ তুলে নিতে হবে এবং জনগণের মৌলিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ...।

পাকিস্তানে সচেতন নাগরিকদের মনের কথাটিই জামাতে ইসলামী পাকিস্তান বলে দিয়েছেন। এজন্যে আমরা তাদেরকে সাধুবাদ দিচ্ছি। আল্লাহ্ করুন দেশটিতে পুনরায় সত্যিকারের ইসলাম ও মৌলিক অধিকার সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠিত হোক।

-নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ-৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
■ হাদীস শরীফ ঃ মন্দকাজে মু'মিনের প্রতিক্রিয়া	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ আহমদ	৪
■ অমৃত বাণী ঃ পর্দার আদেশ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৫
■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার মু'মিন সিফতের আরও ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৬-৯
■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১০-১১
■ নবুওয়তের কল্যাণ প্রবহমান	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১১-১২
■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'আযীয' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩-১৭
■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৮-১৯
■ রসূল (সঃ)-এর সাহাবাগণের জীবন-চরিত্র মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২০-২১
■ ছোটদের পাতা ঃ ফুলের তোড়া (গুলদাস্তা) (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক)	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২২
■ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা নিরূপণের উপায়	ঃ জনাব মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী	২৩-২৪
■ প্রতিবেদন ঃ ● সুন্দরবন জামাতের ২১তম সালানা জলসা	ঃ প্রতিবেদক, পাক্ষিক আহমদী	২৫-২৬
● ঘড়িলাল জামাত পরিদর্শনে ন্যাশনাল আমীর	ঃ " " "	২৭-২৮
■ নতুনদের পাতা		
● কাশ্মীর উপত্যকায় প্রথম দায়ী ইলাল্লাহ্; হযরত মাওলানা মাহবুব আলম (রাঃ)	ঃ অনুবাদ- জনাব কওসার আলী মোল্লা	২৯-৩০
● হযরত মূসা (আঃ)	ঃ মৌঃ মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন	৩১-৩৩
● রহস্যময় একটি কবর	ঃ মৌঃ মোঃ মজিদুল ইসলাম	৩৪-৩৫
● পার্থিব জীবন ভোগ্য-সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়	ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন	৩৬
● প্রসঙ্গ ঃ কাদিয়ান	ঃ মৌঃ শাহ্ আলম স্বপন	৩৭-৩৮
■ সংবাদ	ঃ	৩৯-৪০

প্রচ্ছদ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগরের ২০তম সালানা জলসার দৃশ্য

এখরাজে নেযামে জামাত

১। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সদস্য জনাব ফরিদ আহমদ, মিসেস ফরিদ আহমদ এবং তাঁদের পুত্র জনাব জসীম আহমদ ও শামীম আহমদকে জামাতী শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্যে 'এখরাজে নেযামে জামাত' করে দিয়েছেন।

উপরোক্ত ৪ জনের নিকট থেকে কোন প্রকার চাঁদা নেয়া যাবে না।

২। অনুরূপভাবে হুযূর (আইঃ) আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রাজশাহীর সদস্য জনাব বজলুর রহমানকে জামাতী শৃঙ্খলা ভঙ্গের দরুন 'এখরাজে নেযামে জামাত' করে দিয়েছেন।

এখন থেকে জনাব বজলুর রহমান সাহেবের কাছ থেকেও কোন প্রকার চাঁদা নেয়া যাবে না।

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্
জেনারেল সেক্রেটারী

এখরাজ থেকে অব্যাহতি

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) আহমদীয়া মুসলিম জামাত বগুড়া-এর সদস্য জনাব এ এইচ এম মোমতাজ আলীকে বার বার ক্ষমা চাওয়ার প্রেক্ষিতে এখরাজে নেযামে জামাত থেকে অব্যাহতি দিয়ে ক্ষমা করেছেন, আল্হামদুলিল্লাহ্।

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, জেনারেল সেক্রেটারী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা

২৬-২৮ জুলাই ২০০২, রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এ জলসার সার্বিক সফলতার জন্যে বন্ধুগণের নিকট দোয়ার আহ্বান করা যাচ্ছে। - আহমদী বার্তা

বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধায়ীগণকে জানাই শুভেচ্ছা। এ নতুন বছরটি সবার জন্যে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসুক। - নির্বাহী সম্পাদক

সূরাতুল আ'রাফ-৭

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। অতঃপর আমরা তাদের পরে[১০১৯] মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার নেতৃবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করলো।[১০২০] অতএব দেখ, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী হয়েছিল!

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। এবং মূসা বললো, হে ফেরাউন! নিশ্চয় আমি বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালকের নিকট থেকে (প্রেরিত) রসূল;

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। এটাই ন্যায়সঙ্গত[১০২১] যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত আমি যেন কোন কিছু না বলি। আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট এসেছি, অতএব তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে যেতে ছেড়ে দাও।[১০২২]

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। সে বললো, 'তুমি যদি কোনও নির্দশন এনে থাক তা হলে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٨﴾

১০৮। সুতরাং সে (মূসা) তার লাঠি নিক্ষেপ করলো। তখন দেখ! তৎক্ষণাৎ তা (দেখতে) এক সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল।[১০২৩]

১০১৯। "তাদের পরে" শব্দ দু'টি জনসাধারণ্যে প্রচলিত যে ধারণা, হযরত শোআয়ব (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর সমসাময়িক এবং তাঁর শ্বশুর ছিলেন, তা খন্ডন করেছে।

১০২০। "যুলুম" অর্থ অন্যায় আচরণ করা, কোন বস্তুর ভুল ব্যবহার করা যা তৎপ্রতি অন্যায় করা বা তাকে সঠিক স্থানে না রাখা (লেইন)। এ উক্তির মর্মার্থ হলো, ফেরাউন ও তার প্রধানগণ ঐশী নিদর্শনগুলির প্রতি উপহাস ও ব্যঙ্গ করেছিল।

১০২১। "হাকীক" অর্থ-উপযোগী, বিন্যস্ত, সঙ্গ, মিলন বা সমাবেশ, ন্যায়সঙ্গত, উপযুক্ত, মানানসই (লেইন)।

১০২২। হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনের নিকট গেলেন তখন তার নিকটে মূসা (আঃ)-এর মিশন প্রচারের উদ্দেশ্য ততবেশী ছিল না যতবেশী ছিল ইস্রাঈলীদেরকে তাঁর অনুগমন করতে দেয়ার জন্য তার নিকট আবেদন করা, যদিও সাধারণভাবে তাকে তিনি তবলীগও করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মূসা (আঃ)-এর বার্তা বা বাণীর লক্ষ্য মূলতঃ ছিল ইসরাঈলী, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তারা মিশরের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত হযরত মূসা (আঃ)-কে উভয় শ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যেই প্রচার করতে হতো। যখন ইহুদীরা সেই দেশ ত্যাগ করলো অর্থাৎ মিশর থেকে হিজরত করে গেল, তখন থেকে মিশরীদের সঙ্গে তাঁর (মূসা-আঃ) আর কোন সম্পর্ক রইল না এবং তিনি নিজ জ্ঞাতি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অর্থাৎ যাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের প্রতি তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলেন।

১০২৩। পবিত্র কুরআন করীম মূসা (আঃ)-এর লাঠিকে সর্পে পরিবর্তিত করার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার করেছে, যথা ঃ ২০ঃ২১ আয়াতে "হাইয়াতুন", ২৭ঃ১১ ও ২৮ঃ৩২ আয়াতদ্বয়ে " জা-ন্ন" এবং ২৬ঃ৩৩ ও তফসীরাধীন আয়াতসমূহে "সূ'বান"। প্রথমোক্ত শব্দ সর্বপ্রকার সাপের জন্য সাধাণভাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় শব্দটি ছোট সাপ বুঝায়। তৃতীয় 'সূ'বান' শব্দ মোটা ও দীর্ঘ (অজগর) সর্প নির্দেশ করে। এরূপে কুরআনের পৃথক পৃথক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং প্রত্যক্ষরূপে বিশেষ বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাপের তরিৎগতি বুঝাবার জন্য "জা-ন্ন" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর বিরাটকায় হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে "সূ'বান" ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে যষ্টির কেবল সাপের রূপ নেয়ার ঘটনাটি উল্লেখ হয়েছে। সেখানে হাইয়াতুন ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর একা উপস্থিতিতে কেবল যখন যষ্টি সর্পে রূপান্তরিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে যেখানে 'জা-ন্ন' শব্দ এসেছে যার অর্থ ছোট সাপ। কিন্তু যেস্থানে ফেরাউন, যাদুকর এবং জনসাধারণের সম্মুখে লাঠির সাপে রূপ নেয়ার বিস্ময়কর ব্যাপার প্রদর্শিত হয়েছে সেস্থানে "সূ'বান" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে এই সকল পৃথক শব্দের মর্মার্থ বিভিন্ন। "হাইয়াতুন" শব্দের মর্মার্থ হলো, কার্যতঃ ইসরাঈলীরা একটি মৃত জাতিতে পরিণত হয়েছিল, ('আসা' শব্দের দ্বারা সম্প্রদায় বুঝায়) যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে এক তেজোদীপ্ত নতুন জীবন লাভ করবে (একই মূল- 'হাইয়্যা' শব্দের ব্যাখ্যা)। 'জা-ন্ন' (ছোট, দ্রুতগতিসম্পন্ন সর্প) শব্দের মর্মার্থ হলো, নগণ্য এবং অধঃপতিত এক সম্প্রদায় থেকে তারা (ইসরাঈলীরা) অতি দ্রুত উন্নতি করবে এবং ফেরাউন ও তার জাতির জন্য এক 'সূ'বান' (বিরাট ও বিশালায়তন সর্প) অর্থাৎ অজগরে পরিণত হবে, অর্থাৎ তারা (ইসরাঈলীরা) তাদের (ফেরাউনের) ধ্বংসের উপায় ও কারণ হবে। এখানে উল্লেখ্য, অন্যান্য বিস্ময়কর বিষয়ের মতই আল্লাহ্তাআলার নবী কর্তৃক এই অলৌকিক ঘটনা বা মু'জিযা প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ নয়। যদি কোন ব্যাপার বাস্তবে ঘটেছে বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে তাকে সত্য বলে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, যদিও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানানুযায়ী তা আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যত বেশী হোক না কেন, তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অতএব আমাদের সীমাবদ্ধ এবং অপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বাস্তবে সংঘটিত কোন ঘটনাকে আমরা কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না। এছাড়া হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনা বা মু'জিযা জনসাধারণ্যে প্রচলিত ধারণানুযায়ী ঘটে নি। আল্লাহ্তাআলার নবীগণের বিস্ময়কর নিদর্শন প্রকাশ ভোঁজবাজীর হস্ত-কৌশল বা ম্যাজিক নয়। এরূপ নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো, এক মহান নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থার সৃষ্টি করা যার ফলে আল্লাহ্তাআলার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, ধর্মানুরাগের চেতনা এবং আল্লাহ্-ভীতি তাদের অন্তরে জন্ম নেয়। যদি যষ্টি প্রকৃতই সর্পাকার ধারণ করে থাকতো, তা হলে তা একজন নবীর অলৌকিক নিদর্শন অপেক্ষা যাদুকরের ম্যাজিক বা ভোঁজবাজীই মনে হতো। এ বিস্ময়কর ঘটনা সম্পর্কে বাইবেল যা-ই বলুক, কুরআন করীম এ ধারণা বা মতের সমর্থন করে না যে, লাঠি বাস্তবে সত্য সত্যই জীবন্ত সর্পের আকার ধারণ করেছিল। এরূপ কোন ব্যাপার ঘটেছিল বলেও প্রতীয়মান হয় না। লাঠিটি দেখতে কেবল দ্রুতগতিসম্পন্ন সাপের মতই মনে হয়েছিল। অলৌকিক ঘটনা এক প্রকার কাশ্ফ (দিব্য-দর্শন) যার মধ্যে দর্শকের দৃষ্টিকে আল্লাহ্ হয়তো বিশেষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এমন করেছিলেন। এ কাশ্ফে ফেরাউন তার পরিষদবর্গ এবং যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে সহদর্শকের স্থান পেয়েছিল। যষ্টি যষ্টিই রয়েছিল, মূসা (আঃ) এবং অন্যান্যদের নিকট তা কেবল সাপের মত দেখাচ্ছিল। এটা সার্বজনীন বিস্ময়কর এক আধ্যাত্মিক ব্যাপার যে, কাশ্ফে মানুষ যখন জড়দেহের উর্ধ্বে উন্নীত হয় এবং ক্ষণকালের জন্য আধ্যাত্মিক গগনমন্ডলে পরিভ্রমণ করে বেড়ায়, তখন সে এমন ব্যাপার ঘটতে দেখে যা তার জ্ঞানের বাইরে এবং তা জড়চক্ষে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি সর্পরূপে দেখতে পাওয়ার ঘটনা এরূপ এক অলৌকিক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা।

একইভাবে এরূপ বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক ঘটনা ঘটেছিল আঁ হযরত (সঃ)-এর সময়ে যখন চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত দেখা গিয়েছিল, তা না কেবল নবী করীম (সঃ) দেখেছিলেন বরং তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও কয়েকজন এবং বিরুদ্ধবাদীও তা (চন্দ্র) বিভক্ত বা দ্বিখন্ডিত হওয়া দেখতে পেয়েছিলেন (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)। রসূলে করীম (সঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন তাঁর সাহাবাগণ (রাঃ) যাঁরা তাঁর সঙ্গে বসা ছিলেন সেই সময়ে তাঁরা জিব্‌রাঈলকে (আঃ) দেখতে পেয়েছিলেন যাকে নবী করীম (সঃ) পুনঃ পুনঃ কাশ্‌ফে দেখতে পেতেন (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)। একইভাবে বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মধ্যেও অনেকে ফিরিশ্‌তা দেখতে পেরেছিলেন (জরীর,৬ষ্ঠ ৪৭ পৃঃ)। এরূপ এক কাশ্‌ফী ঘটনা ঘটেছিল যখন মুসলিম সেনাবাহিনী খ্যাতনামা সেনাপতি সারিয়াহ্ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ইরাকে শত্রুসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল সেই সময় দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) মদীনায় শুক্রবারে জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন,তখন তিনি দিব্য-দর্শনে অর্থাৎ কাশ্‌ফে দেখতে পেলেন মুসলমান সৈন্যগণ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুসেনার নিকট কাবু হয়ে যাচ্ছিল এবং এক সর্বনাশা পরাজয় আসন্ন। অবিলম্বে তিনি (হযরত ওমর-রাঃ) আকস্মিকভাবে খুতবা দেয়া বন্ধ রেখে, মেহরাবের ওপর হতে উচ্চঃস্বরে বলে উঠলেন ঃ "ওহে সারিয়াহ্ পাহাড়ের দিকে যাও, পাহাড়ের দিকে যাও" অর্থাৎ নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। শত শত মাইল দূরে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কানফাটা শব্দের মধ্যেও সেনাপতি সারিয়াহ্ হযরত ওমর (রাঃ)-এর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন এবং খলীফার নির্দেশ পালন করেছিলেন এবং মুসলমান সৈন্যরা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন (খামিস, ২য়, ৩৭০ পৃঃ)।

হযরত মূসা (আঃ)-এর অলৌকিক নিদর্শন এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করতো। তাকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর হাতের যষ্টি মাটিতে নিক্ষেপ করতে বললেন, তা তখন তাঁর নিকট সাপের মত মনে হয়েছিল এবং যখন আল্লাহ্‌তাআলার আদেশে তিনি তা হাতে তুলে নিলেন, তখন তা এক কাষ্ঠখন্ড ব্যতীত অন্য কিছুই রইলো না। এখন কাশ্‌ফ বা স্বপ্নের ভাষায় সর্প হলো শত্রুর প্রতীক এবং লাঠি হলো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী বা দলের প্রতীক (তা'তীরুল আনআম)। এরূপে উক্ত কাশ্‌ফের সাহায্যে আল্লাহ্‌তাআলা মূসা (আঃ)-কে জানিয়েছিলেন, যদি তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ছেড়ে দেন বা ত্যাগ করেন তা হলে তারা সর্পের ন্যায় অধঃপতিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তিনি তাদেরকে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন করেন তা হলে তারা সৎ ও আল্লাহ্-ভীরু লোকের এক শক্তিশালী এবং সুশৃংখল জাতিতে পরিণত হবে।

হাদীস শরীফ

মন্দ কাজে মু'মিনের প্রতিক্রিয়া

কুরআন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

অর্থ ঃ (হে নবী) তুমি সবসময় মার্জনার নীতি অবলম্বন করো ও ন্যায়-নীতির আদেশ দাও আর মূর্খ লোকদিগের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও (সূরাতুল আ'রাফ ঃ ২০০)।

হাদীস ঃ

"আন আবী সাঈদিনিল খুদরিয়্যে কালা সামি'তু রসূলাল্লাহে সলাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ইয়াকুলু মান রাআ মিনকুম মুনকারান ফাল ইউগায়্যেরহু বেইয়াদিহি ফাইনলাম ইয়াসতাতি' ফাবিলিসানিহি ফাইনলাম ইয়াসতাতি' ফাবিকালবিহী ওয়া যালেক আযআফুল ঈমানে" (মুসলিম)।

অর্থাৎ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের (কথা) দ্বারা তা প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তরের দ্বারা (অর্থাৎ এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে) (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

এ পৃথিবীতে বহু ধরনের সমাজ রয়েছে, মানুষ রয়েছে। খোদাতাআলা সকল মানুষকে তাঁর রঙ্গে রঙ্গীন হবার জন্য নবী, রসূল প্রেরণ করে পথ-নির্দেশনা দান করেছেন। যাতে বহুমতের ও ধরনের মানুষ উম্মতে ওয়াহেদা বা এক উম্মত হতে পারে। কিন্তু মানুষ স্বাধীন হবার কারণে তা হয় নি। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ মন-মেজাযে ও স্বভাব অনুযায়ী জীবন যাপন করতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু অনেকেই আবার খোদার পথের পথিক হয়ে নিজেদের জীবন চলার পথকে পরিবর্তন করে নেয়। ফলে দু'শ্রেণীর মানুষ আমরা দেখতে পাই। এক শ্রেণী হলো মু'মিন ও অপরটি হলো খোদার পথ হতে বিমুখ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে নসীহত করেছেন যেন, নম্রতা ও ক্ষমাশীলতা তাদের অলংকার হয়। তারা সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও মূর্খদের এড়িয়ে যাবে। উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) জানাচ্ছেন, যদি মন্দ কাজ দেখ তবে তা হাত দিয়ে সম্ভব হলে হাত দিয়ে মুখ দ্বারা সম্ভব হলে মুখ দ্বারা দূর করো নতুবা মনে মনে তা খারাপ জেন অর্থাৎ তা হতে বিমুখ হয়ো। আসলে মানুষ যদি মন্দ কর্মকে ঘৃণা করে তবে সে কাজটি সে করতে পারে না। এ দুনিয়াতে মানুষ অনেক ধরনের অপরাধ করে কিন্তু অনেকে দেখে তার সম্বন্ধে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না, যা অত্যন্ত খারাপ। আজ সারা পৃথিবীতে অন্যায়ের-মন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে; কিন্তু ভালো মানুষ-মু'মিন নিরুপায়। এমতাবস্থায় তার কি কোন কিছুরই করার নেই?

একটু ১৪০০ বছর পিছনে গিয়ে দেখুন। সমগ্র আরব পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত। পাপের প্লাবন বয়ে যাচ্ছিল। সে সময়ে একটি হৃদয় অন্ধকার রাতে নিজের অন্তর খোদার সামনে তুলে ধরলেন। ব্যাকুলতায় আকুতি-মিনতি করে খোদার কাছে কাঁদলেন ফলে দুনিয়ার অবস্থা পরিবর্তন হলো। আজ সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের দাবী হলো দুনিয়ার এহেন মন্দ অবস্থা দেখে ব্যাকুল হৃদয়ে খোদার কাছে দোয়া করা। আল্লাহ্‌র রসূল বলছেন, মন্দ কাজ প্রতিহত করার ক্ষমতা না থাকলে মনে মনে খারাপ ভাবো। ঘৃণা করো। এমনটি হলে হৃদয় নিজে নিজেই দোয়ার দিকে ধাবিত হবে। আজ আমাদের সকলেরই আল্লাহ্‌র রসূলের এ হাদীসটির উপর আমল করে দুনিয়ার মন্দাবস্থা পরিবর্তনের জন্য খোদার নিকট কান্নাকাটি করা উচিত। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে হৃদয় নিংড়িয়ে দোয়া করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

সংকলন ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

পর্দার আদেশ

তদনুযায়ী সম্মানীত কুরআন বলছে ঃ 'তুমি (হে মুহাম্মদ'-সঃ) মুমিনগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত (নিরাপত্তা বিধান) করে, (২৪ঃ৩১)। অর্থাৎ মু'মিনগণকে বলে দাও কারও প্রতি যেন নগ্ন দৃষ্টিতে না তাকায় এবং নিজেদের ছিদ্রপথসমূহের হেফাযত করে। অর্থাৎ, মানুষের উচিত তাদের দৃষ্টি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে যাতে করে ঐ সমস্ত নারীদেরকে (যাদের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ নিষেধ নয়) দেখে যেন বিপদে পড়তে না হয়। কানও ছিদ্র পথের অন্তর্ভুক্ত যদ্বারা বাজে গল্প ও অশ্লীল কথা শুনে মানুষ বিপদ ও সংকটে নিপতিত হয়। এজন্যই সাধারণভাবে বলা হয়েছে- সব অলি-গলি (ছিদ্রপথ)-কে নিরাপদ রাখবে এবং সকল অমিতাচার থেকে বন্ধ রাখবে। ইহা মু'মিনদের জন্য অতি উত্তম (২৪ঃ২৯)। এবং এ ধরনের শিক্ষা এরূপ উচ্চাঙ্গের পবিত্রতার ধারক যার অনুসরণে (মানুষ) পাপাচারীগণের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

দলীল প্রমাণও কুরআন নিজেই উপস্থাপন করে

দ্যাখো, যে বিষয়টি তওরাত এর নিজের ভাষা ও ভাবধারায় বর্ণিত হয়েছে, সেই একই বিষয়টি কুরআন কীরূপ ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও দলীল প্রমাণ দ্বারা জোরালোভাবে বর্ণনা করেছে। এটাইতো কুরআনের অলৌকিকতা যে, সে নিজের অনুসারীদেরকে অপর কারো মুখাপেক্ষী হ'তে দেয় না। দলীল-প্রমাণও নিজেই বর্ণনা করে তাদেরকে পরিতৃপ্ত করে দেয়। কুরআন শরীফ যুক্তি-প্রমাণ সহ আদেশাবলী লিপিবদ্ধ করেছে এবং প্রতিটি আদেশের পৃথক যুক্তি-প্রমাণ দিয়েছে। মোটকথা এ দু'টি বড় পার্থক্য যা তওরাত ও কুরআনে রয়েছে। প্রথমোক্তটিতে (তওরাতে) দলীল-প্রমাণের রীতি নেই। দলীল-প্রমাণ নিজেকেই তালাশ করতে হয়। শেষোক্তটি নিজের দাবীকে প্রত্যেক প্রকারের দলীল দ্বারা প্রমাণিত করার পর উপস্থাপন করে। এবং খোদার আদেশকে বল প্রয়োগে মানতে বাধ্য করে না। বরং মানুষের মুখ দিয়ে অবনত মস্তকে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতির ধ্বনি বের করানো হয়। জবরদস্তি করে বা ভয় দেখিয়ে নয়। ভদ্রভাবে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এবং প্রকৃতিগত ধারায়। তওরাত একটি বিশেষ গোত্রকে সম্বোধন করেছে। এবং কুরআনের সম্বোধিত সমস্ত লোক কেয়ামত পর্যন্ত (শেষ দিবস) যারা জন্মলাভ করবে। এখন বলতো তওরাত এবং কুরআন কীভাবে সম পর্যায়ের হতে পারে? এবং তওরাতের বিদ্যমানতায় কেন কুরআনের প্রয়োজন হবে না? কুরআন যখন বলে "ব্যভিচার করবে না" তখন সমস্ত মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে তা বলা হয়। কিন্তু যখন একই কথা তওরাত বলে তখন সেই বনী ইস্রাইল জাতিকেই উল্লেখ ও সম্বোধন করা হয়ে থাকে। এ দ্বারাও কুরআনের মর্যাদা উপলব্ধি করা যেতে পারে কিন্তু যদি দূরদর্শী ও খোদা-ভীরু অন্তর হয়।

পবিত্র কুরআন নিজের মধ্যে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার খাদ্য সংরক্ষণ করে থাকে।

এছাড়া তওরাত ও কুরআনে এটাও একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে যে, কুরআন নিজের মধ্যে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার খাদ্য সংরক্ষণ করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চন্দ্র দিখন্ডিত হওয়ার মু'জিযা দৈহিক মু'জিযাস্বরূপ। কতক অর্বাচীন চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হবার মু'জিযাকে প্রাকৃতিক নিয়মের ফলশ্রুতি আখ্যা দিয়ে এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। কিন্তু ওদের এতটুকুও জানা নেই যে, খোদাতাআলার শক্তি এবং তাঁর বিধানের পরিমাপ ও অনুমান করা যায় না।

প্রাকৃতিক নিয়মের সীমাবদ্ধতা সম্ভব নয়

কখনো তো সে মুখে 'খোদা' বলে থাকে। কিন্তু এমনকি কখনো তার মন ও আত্মা খোদাতাআলার বিরাট ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তিসমূহকে দেখে সিজদায় অবনত হয়ে যায়। সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ভুলে যায়। যদি খোদার সত্তা ও সীমা এরূপ হয় যে, তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আমাদেরই ধারণা ও অনুমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহলে আবার দোয়ার কী প্রয়োজন থাকে? কিন্তু 'না' আমি তোমাদেরকে বলছি- আল্লাহ্‌তাআলার ক্ষমতা ও পরিকল্পনার কোন সীমাবদ্ধতা করা যায় না। খোদাকে অস্বীকারকারী ব্যক্তিই এরূপ দাবী করতে পারে। কিন্তু ঐ অজ্ঞদের প্রতি কীরূপ পরিতাপ, যারা আল্লাহ্‌তাআলাকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী জেনেও চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার অলৌকিকতাকে প্রকৃতি-বিরোধী বলে থাকে।

মনে রাখবে এসব লোক সুষ্ঠু চিন্তা ও দূরদর্শী অন্তঃকরণের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে নি। খুব স্মরণ রাখবে কখনো প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ভরসা করবে না, অর্থাৎ কোথাও প্রাকৃতিক নিয়মের সীমা রেখা টানবে না যে, বাস্ একটাই খোদার খোদায়ীর অর্থাৎ ঈশ্বরের পূর্ণ রহস্য! তাহলে তো তার ও সূতা খুলে যাবে অর্থাৎ সব পন্ড হয়ে যাবে! না, এরূপ বাহাদুরী ও সাহস দেখানো উচিত নয় যা মানুষকে দাসত্বের মর্যাদা থেকে নীচে ফেলে দেবে এবং পরিণামে ধ্বংস হবে। এরূপ মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করা যেন খোদাতাআলার শক্তি ও ক্ষমতাকে ঘিরে ফেলা ও সীমাবদ্ধ করা কোন মু'মিনের দ্বারা সম্ভব নয়।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজির এ উক্তি খুবই সঠিক, "যে ব্যক্তি বুদ্ধির পাল্লা দ্বারা খোদাকে জানার ইচ্ছা করবে সে অর্বাচীন" (চলবে) (মলফুযাত প্রথম খন্ড)

অনুবাদ- **মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা**

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

আল্লাহ্‌তাআলার মু'মিন সিফতের আরও ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) বলেন, গত বছরের শেষে জুমুআর খুতবায় আল্লাহ্‌তাআলার সিফত 'মু'মিন' সম্পর্কে বক্তব্য দিচ্ছিলাম। বিভিন্ন কারণে এ বিষয়ে আলোচনা শেষ না করে সিফত রায্‌যাক সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম। আজ আবার সিফত 'মু'মিনের' উপর আলোচনাকে অব্যাহত রাখতে চাচ্ছি।

এ সম্পর্কে মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল গ্রন্থে হাদীস আছে। হযরত মাহমুদ বিন লাবিদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত মহানবী (সঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ্‌তাআলা নিজ বান্দাদেরকে ইহজগতের [লোভ লালসা] হ'তে এমনভাবে রক্ষা করেন যেমন তোমরা তোমাদের কোন রোগীকে অখাদ্য থেকে, যা খেলে তার রোগ বৃদ্ধি হ'তে পারে, রক্ষা কর" (মুসনাদ আহমদ, বাকী মুসনাদ আনসার)।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পার না যতক্ষণ না সে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য ঠিক তা-ই পসন্দ করবে যা সে তার নিজের জন্য পসন্দ করে" (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর তফসীরে আছে, "এবং তাদের কাছে কোন কথা আসে, ভাল খবর বা কোন ভয়ের খবর, তারা সে কথা বা খবরকে প্রচার করে দেয়। কিন্তু তারা যদি কোন বার্তা বা খবরকে নিজেরা প্রচার না করে প্রথমে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বলত তবে ভাল করত। অথবা এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে, যারা ঐ খবর বা বার্তা সম্পর্কে জরুরী বিষয় বের করতে পারেন তাদের কাছে গিয়ে বলত তবে ভাল হ'ত। যদি আল্লাহ্‌র খাস ফযল (অনুগ্রহ) না হত তোমরা শয়তানের দাস হয়ে যেতে" (হাকায়েকে ফুরকান, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৭)।

"ইল্লাকালীলান অর্থ ঃ বাগধারামতে 'অল্প লোক নয় বরং সকলে যারা সেখানে আছে'।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) আরো বলেছেন, "ওয়াদা বা ওয়াইদ সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন শরীফে যেভাবে যেভাবে আছে সেভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।" **ইযা জায়াহুম আমরুম মিনাল** আমনে ..." [যখনই কোন কথা তোমাদের কানে আসে সাথে সাথে তা প্রচার করা] কুরআন শরীফ এ পদ্ধতিকে নিষেধ করেছে। কোন ভাল মন্দ খবর শোনার পর তা মহান ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য কাউকে বলে দেয়া উচিত নয়। মুসলমানেরা যেমন সামাজিক সুব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়, তেমনই নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কেও না" (হাকায়েকে ফুরকান, ২য় খন্ড; ৪৭ পৃষ্ঠা)।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

অর্থ ঃ যারা ঈমান এনেছে ও নিজেদের ঈমানকে অন্যায়ের সাথে মিশায় নি, এরাই এমন যে, তাদের জন্যে নিরাপত্তা নির্ধারিত আছে আর তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত (সূরাতুল আনআম ঃ ৮৩)। এখানে মু'মিন অর্থ নিরাপত্তাদানকারী ও নিরাপত্তা লাভকারী উভয় অর্থই প্রযোজ্য।

হযরত আবূ বুরদা (রাঃ) নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। "আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর সঙ্গে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। তারপর ভাবলাম, চলো কিছুক্ষণ বসে যাই তাহলে ইশার নামায পড়েই যেতে পারব। সুতরাং আমরা বসে রইলাম। কিছু সময় পরে আঁ হযরত (সঃ) বেরিয়ে আসলেন, আমাদের দেখে বললেন, 'তোমরা এখনও এখানেই আছ!' আমরা বল্লাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আপনার সাথে মাগরিবের নামায আদায় করেছি। তারপর ভাবলাম, আমরা বসে থাকি এবং আপনার সাথে ইশার নামায পড়ে তারপর যাব। হুযূর (সঃ) বললেন, তোমরা খুব ভাল করেছো! খুব ভাল করেছো! তারপর হুযূর (সঃ) নিজ পবিত্র মাথা আকাশের দিকে তুললেন, যেমন তিনি প্রায়শঃ এ রকম করতেন, তারপর বললেন, নক্ষত্ররাজি আকাশের জন্য নিরাপত্তার কারণ। তারপর একদিন নক্ষত্ররাজি ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আকাশে মহাবিপদ দেখা দিবে। যদ্বারা একে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আমি আমার সাহাবায়ে কেরামের জন্য নিরাপত্তার কারণ হয়ে আছি। তারপর আমার অন্তর্ধানের পরে সাহাবাদের জন্য সংকট সৃষ্টি হবে যদ্বারা তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আমার সাহাবায়ে কেরাম আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তার কারণ। সাহাবায়ে কেরাম যখন গত হয়ে যাবেন তখন আমার উম্মতের উপর মহাবিপদ আসবে যদ্বারা তাকে ভীতি-প্রদর্শন করা হয়েছে" (মুসলিম, কিতাব ফাযায়েলে সাহাবা)।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাইয়্যেব অর্থাৎ পরিষ্কার ও সুষম খাদ্য খেয়েছে এবং সুন্নতের মধ্যে থেকে কার্যক্রম করেছে এবং মানুষ তার অন্যায়-আচরণ থেকে নিরাপদ থেকেছে (অর্থাৎ সে কারো সাথে অসদ্ব্যবহার করে নি) সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে।" একথা শুনে এক ব্যক্তি বললেন, হুযূর! আজকাল তো এমন লোক অনেক আছেন। হুযূর (সঃ) বললেন, আমার পরে কয়েকশ' বছর পর্যন্ত এমন ভাল লোক পাওয়া যাবে" (তিরমিযী, কিতাব সিফাতুল কিয়ামাহ্)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, বাল্যকালে যখন আমার কোন কিছু বুঝবার মত বয়স হয়েছিল তখন আমি আমার পিতা-মাতাকে মুসলমান অবস্থায় পেয়েছিলাম। কোন দিন এমন হয় নি যে, সকাল বা সন্ধ্যায় হুযূর (সঃ) আমাদের বাড়ীতে না গিয়েছেন। একবার যখন মক্কায় মুসলমানদের উপর যুলুম-অত্যাচার খুব বেশি বেড়ে গেল, তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) একদিন আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করে যাবার নিয়্যত করে বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে গেলেন। যখন তিনি 'বারকুল গেমাদ' নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন সেখানে ইবনুদ্ দাগানার সাথে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তিনি ক্বারাহ্ গোত্রের সরদার ছিলেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' আবূ বকর (রাঃ) জবাব দিলেন, 'আমার জাতির মানুষ আমাকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে।' ইবনুদ্ দাগানাহ্

বললেন, আবূ বকর! তোমার মত মানুষকে না তো বের করে দেয়া উচিত, আর না তোমার বের হয়ে যাওয়াই উচিত! তুমি তো এমন পুণ্যকর্ম কর যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তুমি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদয় আচরণ কর, যারা পতিত তাদের তুমি তুলে দাঁড় করিয়ে দাও, তুমি মেহমানদারী কর, জাতির প্রয়োজনে তুমি সকল প্রকার সাহায্য করতে সদাপ্রস্তুত থাক, আমি তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি, তুমি ফিরে চল। সেখানে আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তোমাকে কেউ বাধা দিবে না। আবূ বকর ফেরত এসে গেলেন। ইবনুদ্ দাগানাহ্ ও সাথে সাথে আসলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি কোরায়েশ গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের বললেন, 'আবূ বকর (রাঃ)-এর মত ব্যক্তিত্বকে (কল্যাণমুখী) মানুষকে সমাজ ও দেশ থেকে বের করে দেয়া উচিত নয় আর না তার বেরিয়ে যাওয়া উচিত। তোমরা কি এমন একজন লোককে বের করে দিতে চাও যে নাকি এমন সব পুণ্য কর্ম সম্পাদন করেন যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আত্মীয়দের সাথে সদয় ব্যবহার করেন, পতিত ব্যক্তিদের সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার মত ব্যবস্থা করেন, (অর্থাৎ যারা খুবই অসহায়) অতিথি আপ্যায়ন করেন, জাতির সকল প্রয়োজনে যিনি সবরকম সাহায্যের জন্য সদা প্রস্তুত থাকেন। কোরায়েশের নেতারা ইবনুদ্ দাগানার কথার প্রতিবাদ করে নি এবং তার নিরাপত্তা প্রদানের প্রস্তাবকে তারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু তারা বলল, আপনি আবূ বকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ গৃহে আল্লাহ্‌র ইবাদত করেন। নামায ও গৃহের অভ্যন্তরে পড়বেন। কুরআনও সেখানেই পড়বেন। বাইরে এসে নয়। বাইরে আমাদের লোকদের সামনে তিনি এমন করলে লোকদের কষ্ট নয়। আমাদের ভয় হয় তাঁর কারণে আমাদের মহিলারা ও কিশোররা বিপথগামী হ'তে পারে। আর বিপদ হতে পারে।"

সুতরাং ইবনুদ্ দাগানাহ্ আবূ বকর (রাঃ)-কে এসে কোরায়েশদের কথাগুলো বললেন। হযরত আবূ বকর ঐসব কথা মেনে নিলেন। তিনি নিজ গৃহে নামায ও কুরআন তেলাওয়াত করতেন। কিছুদিন পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মনে হোল যে, উঠানের এক স্থানে নামাযের ব্যবস্থা করলেই তো হয়। অতএব তিনি উঠানের এক প্রান্তে ছোট মসজিদ ঘর বানালেন এবং সেখানে তিনি নামায, কুরআন পাঠ ইত্যাদি করতে থাকলেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল মুশরেকীন (অংশীবাদী) মহিলা, শিশু-কিশোররা সেখানে ভীড় করতে লাগল আবূ বকর (রাঃ)-এর নামায ও তিলাওয়াত দেখার ও শোনার জন্য। কুরায়েশ নেতারা আবার অস্থির হয়ে পড়লেন। তারা ইবনুদ্ দাগানাকে বললেন, 'আবূ বকরকে নিষেধ করেন, তিনি যেন ঘরের ভেতরে নামায কালাম পাঠ করেন। নতুবা তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না। পরে কোন নিরাপত্তা ভঙ্গ হোক এটা আমরা চাই না'।

হযরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন। ইবনুদ্ দাগানাহ্ এসে আবূ বকর কে বললেন, "আপনি জানেন কুরায়েশদের সাথে আমার যেসব শর্ত হয়েছিল। আবার নতুন কথা হয়েছে। আপনি যদি গ্রহণ না করেন তবে আমি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে বা রাখতে পারছি না। কারণ আমি চাই না যে, আমি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়ার পর এখানে কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি হোক আর আমার সম্মান নষ্ট হোক। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, 'আমি আপনার উপর আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়ে রাখতে চাই না। আপনার উপর কোন দায়িত্ব আগামীতে থাকবে না। আমার নিরাপত্তার ভার আমার আল্লাহ্‌র উপর রেখেই আমি আনন্দিত ও নিশ্চিত" [বুখারী, বাব হিজরাতুন্নাবী (সঃ) ইলাল মদীনা]

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহী বুখারী গ্রন্থে আঁ হযরত (সঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে যাবার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সেখানে ইবনে শিহাব এর বর্ণনার উল্লেখ আছে। সুরাকার ভাতিজা আব্দুর রহমান বিন মালেক নিজ পিতা, যিনি নিজ ভাই সুরাকার কাছে শুনে ইবনে শিহাবকে বলেছেন, 'কুরায়েশের পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে আনতে পারলে একশ' উট দিবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সুরাকা একদিন নিজের লোকদের সাথে বসেছিলেন এমন সময় একজন এসে সুরাকাকে বলল, সুরাকা! আমি এখনই সমুদ্রের ধার দিয়ে কয়েকজন লোককে যেতে দেখে এলাম। আমার ধারণা যে, তারাই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও আবূ বকর হবে। সুরাকা বলেছেন, 'আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে, ঠিক তারাই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার লোকজন হবেন। কিন্তু আমি ঐ লোককে সরাবার জন্য বললাম, না না এসব লোক ওরা হবেন না। এরাতো আমাদের সামনে দিয়েই কিছুক্ষণ পূর্বে চলে গেছে'। ...

সুরাকা বলেছেন, কিছুক্ষণ পরে আমি আস্তে করে সেখান থেকে উঠে পড়লাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসন্ধানে যাত্রা করলাম যখন আমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাফেলার অনেকটা কাছাকাছি পৌছে গেলাম তখন আমার ঘোড়ার পা পিছলে পড়ল আর আমি ঘোড়ার সামনে গিয়ে পড়লাম। আমি তাড়াতাড়ি উঠে আমার তারকা থেকে শুভলক্ষণ নেবার জন্য তীর বের করে ফাল (লক্ষণ) নিলাম। আমি বুঝতে ও জানতে চাচ্ছিলাম যে, আমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার লোকদের ধরতে পারব কি না। কিন্তু আমার তীরের ফাল (লক্ষণ) এমন প্রকাশ পেল যা আমার পসন্দ ছিল না। যাই হোক, আমি আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে পিছু নিলাম, ফালকে অগ্রাহ্য করলাম। এবার আমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর এত কাছে গেলাম যে, তাঁর তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছিলাম। আঁ হযরত (সঃ) পিছে ফিরে দেখেন নি। কিন্তু হযরত আবূ বকর বারবার পিছে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। এমন সময় আবার আমার ঘোড়ার সামনের দু'পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে গেল। আমি দ্রুত উঠে ঘোড়াকে তিরস্কার করলাম। ঘোড়া উঠে দাঁড়াল, পা টেনে মাটির নীচ থেকে বের করল। এতে এতবেশি মাটি (ধূলো) উড়ল যেমন আকাশ ধূঁয়ায় ভরে যায়। আমি আবার তীর টেনে ফাল নিলাম (লক্ষণ) কিন্তু এবারও ফাল বের হোল যা আমি পসন্দ করি নি। এবার আমি ভড়কে গেলাম (ভয় পেলাম) এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর কাফেলার উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে চিৎকার করে ডাকলাম এবং আমি কোন ক্ষতি করব না বলে অঙ্গীকার করলাম। তাঁরা আমার কথায় বিশ্বাস করে থেমে গেলেন। আমি আমার ঘোড়ার উপর বসে তাঁদের নিকটে গেলাম। আমার বার বার ঘোড়ার পড়ে যাওয়া থেকে আমি বুঝলাম, আঁ হযরত (সঃ)-এর ক্ষতি করা যাবে না। অবশ্যই তিনি বিজয়ী হবেন একদিন। আমি তাঁদেরকে মক্কার খবরা-খবর বললাম। তারপর আমি আঁ হযরতের খেদমতে আবেদন করলাম যে, আমাকে নিরাপত্তার লিখিত সনদ দেয়া হোক। আঁ হযরত (সঃ) আমের বিন ফুহায়রাকে নির্দেশ দিলেন আর সে আমাকে একটি সনদ লিখে দিল। তারপর তাঁরা সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন" (বুখারী, বাব হিজরাতুন্নবী)।

অতএব হিজরতের সফরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে একা ছিলেন না আরো কয়েকজন ছিলেন। তবে হ্যাঁ, সওর গুহায় আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে হযরত আবূ বকর একাই ছিলেন। হিজরতের সফরে একজন লিখতে পারেন এমনও ছিলেন এবং মদীনায় পৌছা পর্যন্ত আরো অনেকে হুযূর (সঃ)-এর সাথে শামিল হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আবূ বকর (রাঃ) একাই সফর সঙ্গী ছিলেন একথা ঠিক নয়।

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত বরাআ বিন আযেব (রাঃ)-এর একটি রেওয়ায়াত সহী বুখারীতে লিখেছেন (বুখারী, বাব, আলামাতুন নবুওয়ত ফীল ইসলাম)। হযরত বরাআ বিন

আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সুরাকা বিন মালেক আমাদের পিছু নিয়েছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম! হুযূর (সঃ) বললেন, **লাতাহযান্ ইন্নাল্লাহা মা'না** চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। হুযূর সুরাকার অসদাচরণ হতে রক্ষার জন্য দোয়া করলেন। ফলে তার ঘোড়া পেট পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে গেল। সুরাকা চিৎকার করে বলল, 'আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, 'আপনি বদ দোয়া দিয়েছেন। এবার আবেদন করছি আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। শুধু তাই নয়। অতঃপর আমি তাদেরকেও ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করব যারা আপনার সন্ধানে খুঁজে বেড়াচ্ছে'। এরপর হুযূর (সঃ) তার জন্য দোয়া করলেন যার ফলে তার বিপদ কেটে গেল। সুরাকা ফেরত যাত্রা করল এবং রাস্তায় যাদের সাথে দেখা হোত তাদের বলত, 'এদিকে কিছু নেই খামাখা যেয়ে তোমাদের কোন লাভ হবে না।' এই বলে সবাইকে ফেরত পাঠাত। এমনিভাবে সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করেছিল।

একটি হাদীসে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর বর্ণনা আছে। তিনি বলেছেন, 'আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে সওর গুহার মধ্যে আরয করেছিলাম, 'তারা (অনুসন্ধানীরা) যদি কেউ নীচে পায়ের কাছে ঝুঁকে উঁকি দেয় তবে সে নিশ্চয় আমাদেরকে দেখে ফেলবে।' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'হে আবূ বকর! এ দু'জন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাদের সাথে তৃতীয়জন আল্লাহ্ আছেন" (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"যখন মানুষের মধ্যে মুহব্বতে ইলাহী (আল্লাহ্‌র ভালবাসা) এবং সকল বিষয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত হয়ে যাওয়ার প্রবণতা পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করে তখন এ রকম হয়ে যায় যেমন আল্লাহ্ তার কান হয়ে যান যদ্বারা সে শুনে, আল্লাহ্ তার চোখ হয়ে যান যদ্বারা সে দেখে; আল্লাহ্ তার হাত হয়ে যান যদ্বারা সে ধরে; তার পা হয়ে যান যদ্বারা সে চলাচল করে; তখন কোন অবিচার বা অন্ধকার তার মধ্যে বাকী থাকে না এবং সে সকল প্রকার ভয় ও বিপদ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়। এ অবস্থার প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

(সূরাতুল আনআম ঃ ৮৩)

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড; পৃঃ ৫৪৮, ৫৪৯)

অন্য একস্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "অনেক সময় মানুষ বিরাজমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখে নির্ভীক হয়ে যায় এবং মনে করে যে, 'আমি তো নিরাপদে আছি।' কিন্তু এটি ভুল। কারণ সে জানে না, অতীতে কী হয়েছিল, কত রকম অনিয়ম আর অন্যায় আর দুর্বলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। সুতরাং নিরাপত্তার জন্য খুবই জরুরী যে, সে যেন কখনও নির্ভীক হয়ে বসে না থাকে এবং সর্বদা তওবা-ইস্তিগফার করতে থাকে। কারণ ইস্তিগফারের ফলে অতীত কৃতকর্মের কুফল থেকে আল্লাহ্‌র ফযলে রক্ষা পেতে পারে। এ তো সত্য কথা যে, তওবা - ইস্তিগফারে পাপ ক্ষমা হয় এবং আল্লাহ্ তাকে পসন্দ করেন" (আল্ হাকাম; ৮ম খন্ড; নং ৮; ১০ই মার্চ ১৯০৪ইং)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্‌তাআলা আমার জামাতের জন্য যদিও বিপদের মধ্যে (প্লেগ) নিরাপত্তা বিধান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে একটি শর্তও আরোপিত আছে এই যে, **লাম ইয়ালবিসু ঈমানাহুম বিযুলমীন"** (৬ঃ৮৩) অর্থ যারা নিজেদের ঈমানের সাথে জুলুম (অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার)-কে মিশ্রিত করবে না তারা নিরাপদ থাকবেন। ...**লাম ইয়ালবিসু ঈমানাহুম বিযুলমীন"** এখানে জুলুম অর্থ শিরক (আল্লাহ্‌র অংশীদার) অর্থ ঃ এমন শিরক নয় যেমন হিন্দুরা পাথরের প্রতিমা পূজা করে অথবা অন্যরা অন্য কোন বস্তুকে সিজদাহ্ করে। বরং এখানে (জুলুম) শিরক অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি বা কোন কিছুর প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং তার উপর ভরসা করা বা নির্ভরশীল হওয়া। এমনকি নিজ অন্তরে যেসব পরিকল্পনা এবং চালাকী করে রেখেছে তার উপর ভরসা করা যদি কেউ এমন করে তবে এটা শিরক" (বদর, ২য় খন্ড; নং ৪৩; ১৬ নভেম্বর, ১৯০৩ইং পৃঃ ৩৩৩)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"একথা অনস্বীকার্য যে, কোন কোন মু'মিনেরও প্লেগ হতে পারে। কিন্তু স্মরণ থাকে যেন যে, সে এমন মু'মিন যে কামেল নয়। এ কারণেই আমার ইলহামের মধ্যে আছে যে, তারা প্লেগ হতে নিরাপদ থাকবেন যারা **লাম ইয়ালবিসু ঈমানাহুম** যারা ঈমানের সাথে শিরক (যুলুম)-কে মিশ্রিত করে না। এরা সনদপ্রাপ্ত। অর্থাৎ তাদের ঈমানী নূরের মধ্যে কোন প্রকার কালিমা মিশ্রিত হয় নি। আর এ মর্যাদা কামেলীন (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) ছাড়া অন্য কেউ লাভ করতে পারে না। ৬ষ্ঠ হিজরীতে প্লেগের আক্রমণ হয়েছিল তখন কোন মুসলিম তাতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান নি।"

আঁ হযরত (সঃ)-এর যমানায় ৬ষ্ঠ হিজরীতে প্লেগের আক্রমণ হয়েছিল, তখন কোন মুসলমান এতে মারা যান নি।

"কিন্তু যখন হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে প্লেগের আক্রমণ হয়েছিল তখন কতকজন সাহাবীও শহীদ হয়েছিলেন। কারণ এই যে, কেবল মাত্র কামেল মু'মিনই এমন বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবেন" (বদর, ৬ষ্ঠ খন্ড; নং ১৭; ১৪ই এপ্রিল ১৯০৭ইং পৃষ্ঠা ঃ ৭)

হুযূর (আঃ) সূরাতু আলে ইমরানের ১৫৫ নং আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, (তিরমিযী কিতাবুত্ তফসীর) হযরত আবূ তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আমি আমার মাথা তুললাম। দেখি কি যে, সাহাবাদের প্রায় সবাই নিজ নিজ ঢালের নীচে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢুলছেন। এ অবস্থার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে- **সুম্মা আনযালা আলায়কুম মিন বা'দীল গাম্মে আমানতান্ নুয়াসা** (৩ঃ১৫৫) অর্থ ঃ তিনি ঐ দুঃখের পর তোমাদের উপর তন্দ্রারূপে প্রশান্তি নাযেল করেছিলেন।

হযরত আবূ তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম যাদের তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেছিল। এমন কি আমার হাত থেকে বারবার তলোয়ার পড়ে যাচ্ছিল। তলোয়ার পড়ে যেত আমি উঠাতাম। তারপর আবার পড়ে যেত আমি আবার উঠাতাম (বুখারী-কিতাবুত্ তফসীর)।

মু'মিন শব্দের একটি অর্থ অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি পালনকারী। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) যখন কোন যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করতেন অথবা হজ্জ বা উমরাহ্ হতে ফেরত আসতেন, প্রত্যেক উচ্চস্থানে পৌছে ৩ বার **আল্লাহু আকবর** বলতেন, আরো বলতেন, **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু। লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লে শায়য়িন ক্বদীর** অর্থাৎ তিনি এক-অদ্বিতীয়; তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; তাঁর কোন শরীক নেই; সমস্ত রাজত্ব ও আধিপত্য তাঁরই; সকল প্রশংসার মালিক তিনি; তিনি সর্বশক্তিমান। তারপর বলতেন, **আইবুনা তাইবুনা আবিদুনা মাজিদুনা লিরাব্বীনা হামীদুনা সাদাকাল্লাহু ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহ্‌যাবা ওয়াহ্‌দাহু।**

অর্থ ঃ আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর উদ্দেশ্যে তওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী, তাঁকেই কেবল সিজদাহ্ করি। তাঁরই প্রশংসা করি। আল্লাহ্ নিজ প্রতিশ্রুতি

পালন করেছেন, নিজ বান্দার সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সকল শত্রু-বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবীয়ে কারীম (সঃ) বদরের ময়দানে গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে (যার ভেতরে মক্কার কাফিরদের মৃতদেহ ফেলে রাখা ছিল) তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

"তোমরা কি তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পুরোপুরি পেয়েছ আল্লাহ্ তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন?"

তারপর হুযূর (সঃ) বললেন, আমার কথাগুলো যা আমি তাদের বললাম তারা শুনেছে।

উপরোক্ত ঘটনা যখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট বলা হয়েছে তখন তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় হযরত উমর বুঝতে ভুল করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছিলেন,

"নিশ্চয় এসব মৃত ব্যক্তিরা এখন বুঝে গেছে যে, 'আমি যা তাদের বলতাম তা-ই সঠিক সত্য।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, হযরত রসূল (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে পড়ে এবং এ পথে বেরুবার কারণ যদি হয় কেবল আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করা, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখা, আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করা, তবে আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন যে, তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা তাকে পুণ্য ও মালে গণীমত সহকারে তার গৃহে ফেরত পৌঁছে দিবেন যেখান থেকে সে বেরিয়েছিল" (সুনান নাসায়ী, কিতাবুল ঈমান)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, যুদ্ধের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা গেছে যে, বসে বসেই অজানা কারণে মানুষ খুশী হয় অথবা দুঃখ পেয়ে যায়। তারপর কোন দিন হয়ত খুশীর খবর আসে অথবা দুঃখজনক খবর আসে। এর থেকে বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতের ঘটনার সাথে রূহের এক সম্পর্ক আছে।এই বিধান মতই কোন সৈনিকের যদি ঘুম পায় তবে এর থেকে (শুভলক্ষণ) ফাল গ্রহণ করা হয় যে, যুদ্ধে বিজয় লাভ হবে নিশ্চয়। এভাবে আল্লাহ্ আত্মাকে বা রূহকে এক সূক্ষ্ম স্থান দান করেন। এ বিষয়টি আল্লাহ্তাআলা এখানে বলেছেন, **ইয্ ইউগাশ্শীকুমুন্ নুয়াসা আমানাতাম মিন্হু-ওয়া ইউনায্যিলু আলায়কুম মিনাস সামায়ে মায়ান** পানির উপর কুফফারদের আধিপত্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ মুসলমানদের জন্য অনুগ্রহপূর্বক পানির কষ্ট দূর করে দিলেন।

[বদর পত্রিকার (বিশেষ অংশ) ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ইং]

হুযূর (আইঃ) সূরাতুন নাহলের ১১৩নং আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, **যারাবাল্লাহো মাসালান কারিয়াতান** অর্থ ঃ এখানে এ শহর মক্কাকেই ধরে নাও; যেখানে সকল প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল। স্ত্রীলোকেরা যদি স্বামীর কাছ থেকে ভাল কিছু প্রাপ্ত হয় তবে বলে যে, আমার স্বামী তো রাতের মত শান্ত যেখানে কোন ভয়-ভীতি নেই কোন কিছুর অভাব নেই। মক্কার তুলনা দেয়া হয়েছে। যেখানে কোন অভাব ছিল না, অশান্তি ছিল না। সিরিয়া থেকে আফ্রিকার সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। মানুষ মালামাল নিয়ে আসত। টাকা পয়সা নিয়ে আসত। সরকারী সুবিধা পৃথক ছিল। তারপর তারা অস্বীকারকারী হয়ে গেল। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, **বাদ্দালু নিমতাল্লাহি কুফরাঁওয়া আহাল্লু কুওমাহুম দারাল বাওয়ার** [অর্থ ঃ যারা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে আল্লাহ্র নেয়ামতকে পরিবর্তন করেছে এবং নিজ জাতিকে ধ্বংসের গহ্বরে ফেলেছে (সূরাতু ইব্রাহীম ঃ ২৯)।

আলোচ্য আয়াতে উপরের অবস্থার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। **লেবাসাল জুয়ে ওয়াল খওফে** - ক্ষুধা ও ভয়ের আবরণে তাদের আচ্ছাদিত করা হয়েছিল। মুশরিকীন (অংশবাদীরা) সাহাবায়ে কেরামকে যেমন দুঃখ-কষ্ট দিয়েছিল তেমনই এদের ক্ষুধার জ্বালা প্রদান করা হয়েছিল। মুসলমানরা গম ক্রয় করার সুযোগই পেতেন না তারা ক্রয় করে ফেলত। শাস্তিস্বরূপ এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল যে তারা হাড়, চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হয়েছিল। তারা মুসলমানদের জন্য এমন ভয়-ভীতি সৃষ্টি করেছিল যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ)-কে প্রিয় শহর মক্কা ছেড়ে যেতে হয়েছিল। যার শাস্তি তাদের উপর যুদ্ধের আকারে চাপানো হয়েছিল " (হাকায়েকুল ফুরকান- ২য় খন্ড; পৃঃ ৫১৪-৫১৫)।

এবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ইলহাম পড়ে শোনাচ্ছি। ১৮৮৩ইং এর ইলহাম ঃ **সালামুন আলায়কুম ইয়া ইব্রাহীম**- তোমার প্রতি সালাম হে ইব্রাহীম! তুমি আজ আমাদের দৃষ্টিতে বড় মর্যাদাবান এবং আমানতদার (আমীন বিশ্বস্ত) এবং বড় মেধাবী বুদ্ধিমান। তুমি আল্লাহ্র বন্ধু, খলীলুল্লাহ্, আসাদুল্লাহ্ (আল্লাহ্র সিংহ)। তুমি মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ কর। অর্থাৎ রসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের ফল। তার পরের অংশের অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি আর না তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমরা কি তোমার হৃদয় উন্মুক্ত করি নি? আমরা কি তোমার জন্য প্রত্যেক কথাকে সহজ করি নি? আমরা তোমাকে বায়তুল ফিক্র ও বায়তুয যিক্র প্রদান করেছি। এবং যে ব্যক্তি এ বায়তুয যিক্রে প্রবেশ করবে, খাঁটি হৃদয়ে, আল্লাহ্কে পাওয়ার বাসনা নিয়ে; ইবাদতের উদ্দেশ্য নিয়ে এবং পবিত্র নিয়্যত ও সুন্দরতম ঈমান নিয়ে- সে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা পাবে। বায়তুল ফিক্র অর্থ এই কামরা দালানের ছাদের উপরে যেখানে বসে আমি কিতাব রচনায় মগ্ন থাকি। বায়তুল যিক্র অর্থ আমার এই মসজিদে মোবারক যা বায়তুল ফিক্র এর সাথেই আছে" (বারাহীনে আহমদীয়া ৪র্থ খন্ড; পৃষ্ঠা ৫৫৭-৫৫৯-এর টীকার পাদ টীকা (বা হাশিয়া দার হাশিয়া)। তার পরের ইলহাম যার অর্থ ঃ (আল্লাহ্তাআলা) আমাকে ইলহাম করে বলেছেন, আল্লাহ্র ধর্ম ইসলাম এবং সত্য নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) সকল ইমামগণের সরদার যিনি উম্মী ও আমীন রসূল। সুতরাং যেমন ইবাদত কেবল মাত্র আল্লাহ্র জন্য অবধারিত এবং তিনি এক-অদ্বিতীয় তেমনই আমাদের রসূল (সঃ)- ও একজন যাঁর আনুগত্য অবশ্য কর্তব্য। তিনি এ দিক থেকে একক যে, তিনি খাতামান্নাবীয়ীন (সঃ)" (মিনানুর রহমান, পৃষ্ঠা ঃ ২০)।

অতঃপর ১৯০০ইং সনের একটি ইলহাম ঃ

ফাদখুলুল জান্নাতা ইনশায়াআল্লাহু আমিনীন সালামুন আলায়কুম ত্বিবতুম ফাদখুলূহা আমিনীন- অর্থ ঃ এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে। নিরাপত্তার সাথে, শান্তির সাথে, পবিত্রতার সাথে, হেফাযতের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে" (তায্কিরাহ্ পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৯)।

১৯০২ইং সনের একটি ইলহাম ঃ "একটি উর্দূ ইলহাম হয়েছিল যা অনেক দীর্ঘ ছিল, স্মরণ নেই।" যার সারাংশ এবং মূল বিষয় স্মরণ আছে,- "মুক্তি ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত"। কথাগুলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন (আল্ হাকাম, প্রথম খন্ড; নং ১; ৩১ অক্টোবর ১৯০২ইং পৃষ্ঠা ঃ ১০)।

[আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮-১৪ই মার্চ ২০০২ইং থেকে সংগ্রহ ও অনুবাদ]।

- মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(১১-১২-০১ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রশ্ন নং ১ ঃ ইহুদী এবং অন্যান্য লোকেরা দাবী করে যে, তারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর শিক্ষা অনুসরণ করে অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে, সত্য কথা বলে এবং বিশ্বস্ততা প্রকাশ করে। হুযূর, তা-ই যদি হয় তবে তো এদেরকে ভাল চোখে দেখা উচিত। আপনি এ বিষয় কী বলেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আপনি ভ্রান্তির মধ্যে আছেন। আসল কথা জানেন না। দুনিয়াতে যত বড় বড় "মাফিয়া" (MAFIA) চক্র আছে তাদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে। পবিত্র কুরআন বলে শুধু তারাই ইব্রাহীম (আঃ)-এর সত্যিকার অনুসারী যারা তাকে পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষভাবে অনুসরণ করে।

প্রশ্ন নং ২ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা পৃথিবীতে ১,২৪,০০০ পয়গম্বর পাঠিয়েছিলেন। তারা সবই কি হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না। তারা বিভিন্ন আদমের বংশধর ছিলেন। আল্লাহ্‌তাআলা বিভিন্ন সময় একাধিক আদম সৃষ্টি করেছিলেন। ইবনে আরাবী নামক মুসলমান সাধক একবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, খানা কা'বা প্রদক্ষিণ করার সময় এক মুসলমান অন্য এক ব্যক্তিকে, যার চেহারা ভিন্ন ধরনের ছিল প্রশ্ন করেছিল, "আপনি কি হযরত আদমের বংশধর"? তখন সেই ব্যক্তি পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, "আপনি কোন্ আদমের কথা বলছেন"? হযরত ইবনে আরাবী বলেছেন, মহানবী (সঃ)-এর হাদীসে আছে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে অসংখ্য আদম আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমরা সেই আদম (আঃ)-এর বংশধর যিনি আজ থেকে সাত হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাস ৪০,০০০ অথবা ৬০,০০০ বৎসর পূর্বের। তাই এক আদমের সাথে সকল পয়গম্বর বা নবীগণকে সম্পর্কযুক্ত করা যাবে না।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ আমার দাদী খুব সাদাসিদে ধরনের মহিলা ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলছি। আমি যখন বিদেশ থেকে বাংলাদেশে গেলাম তখন আমি কীভাবে দেশে ফিরেছিলাম তা জানতে চান। আমি যখন বললাম, "প্লেনে করে ফিরেছি" তখন তিনি বলেছিলেন, "আকাশের ঐ ছোট এরোপ্লেনে তুমি কীভাবে আঁট্‌লে?" আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি এরকম সাদাসিদে অ-আহমদী দাদীর কবরের কাছে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে পারি কি না?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ। আপনি তার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে পারেন।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ হুযূর দয়া করে আপনার সেই বয়সের কিছু কথা আমাদের বলুন যাকে TEEN - AGE বলা হয়।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আমি স্কুলে লেখা পড়ায় খুব বেশী ভাল ছিলাম না। প্রত্যেক ক্লাসে বার্ষিক পরীক্ষার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাকে বিশেষ বিবেচনায় পাস করিয়ে উপরের ক্লাসে যাওয়ার সুযোগ দিতেন। স্কুলের শেষ পরীক্ষা এস এস সি বা ম্যাট্রিক পরীক্ষা আমি আল্লাহ্‌তাআলার করুণায়ই এক রকম পাস করেছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে নিজে নিজে পড়ার ও জ্ঞান অর্জন করা স্পৃহা দান করেছেন। আমি আল্লাহ্‌তাআলার করুণায় অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছি, পড়েছি এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছি।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ এক অ-আহমদীর ঢাকা থেকে প্রেরিত প্রশ্ন ছিল ঃ যদি আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম পিতার মাধ্যম ছাড়া হয়ে যাকে তো আল্লাহ্‌তাআলা তাকে আকাশে তুলতে পারবেন না কেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্‌তাআলা যদি হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে তুলে নিয়ে থাকতেন তো তিনি পবিত্র কুরআনে কখনও একথা লিখাতেন না যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পবিত্র কুরআনের ত্রিশ (৩০) টি আয়াত উপস্থাপন করে আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন বলছে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে কাজ করতে গিয়ে পঙ্গু হয়েছেন তাদের জন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অথবা হাদীস শরীফে মহানবী (সঃ)-এর তরফ থেকে কোনো পুরস্কারের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ বিশেষ কোন পুরস্কারের কথা ওখানে উল্লেখ করা হয় নি তবে তারা নিশ্চয়ই শহীদগণের মত ভাল পুরস্কার ও সম্মান পাবেন।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ পবিত্র কুরআনে সূরাতুন্ নিসাতে কয়েক ধরনের আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এটা কি ইসলাম ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য না কি অন্যান্য ধর্মেও ঐ রকম নিষেধাজ্ঞা রয়েছে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ অন্যান্য ধর্মেও কঠোর বিধি-নিষেধ আছে যেমন খৃষ্টানরা নিজেদের Cousin (চাচাতো বা খালাতো ভাই বোন)-কে বিয়ে করতে পারে না।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ মানুষের ভাগ্য কি আগে থেকেই নির্ধারণ করা থাকে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ তকদীর বলে একটা কথা আছে। আমি এ বিষয়ের উপর আগেও বলেছি। এটা একটা ব্যাপক বিষয়। সংক্ষেপে আজ আবার এতটুকু বলতে পারি যে, তকদীরে মুব্‌রামকে পরিবর্তন করা যায় না। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, **কাতাবাল্লাহু লাআগলিবান্না আনা ওয়া রুসুলী** অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রেরিত রসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন। এ তকদীরে মুব্‌রাম কোনদিন পরিবর্তিত হবে না। অন্যান্য তক্‌দীর পরিবর্তিত হ'তে পারে।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ যখন আকীকা করা হয় তো ছেলের ক্ষেত্রে দু'টি খাসি ও মেয়ে হলে একটি খাসি জবাই করতে হয়। এ তারতম্যের কারণ কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এ প্রসঙ্গে আরও একটা প্রশ্নও হ'তে পারে যে, উত্তরাধিকার বন্টনের সময় পুরুষরা মেয়েদের চাইতে বেশি পায় কিন্তু যেহেতু পুরুষকে নিজের

পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করতে হয় এজন্য পুরুষকে উত্তরাধিকার বন্টনের সময় আরও বেশি দেয়া হয় না কেন? আসল কথা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের এটা নিয়ম। এর মধ্যে কল্যাণ আছে।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ আপনি বহুবার বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছেন। আপনার ওখানে কোন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যে, তিনি বাংলাদেশ এত ভাল করে দেখেছেন যে, খুব কম বাঙ্গালীই সেভাবে নিজের দেশকে চেনার সুযোগ পান। হুযূর বলেন, ওখানে একটা কুসংস্কার আছে, কেউ ভ্রমণের সময় কাঁঠাল বহন করলে একটা না একটা বিপত্তি ঘটবেই ঘটবে। হুযূর ও তাঁর সঙ্গী একটা কাঁঠাল নিয়ে এক রিকসায় উঠেছিলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন মোয়াল্লেম শামসুজ্জামান সাহেব। সবাই আশঙ্কা করছিল আমাদের না কোন ঝামেলায় পড়তে হয়। কিন্তু আমরা যখন নিরাপদে মির্যা জাফর আহমদ সাহেবের বাসায় পৌঁছে গেলাম তো সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

হুযূর (আইঃ) আরো বলেন ঃ বাংলাদেশের লোকেরা খুব ভাল। তারা মিষ্টি খুব ভালবাসেন। তাঁর ভাই মির্যা জাফর আহমদ মজা করার জন্য লোকদের বলতেন, যেন তারা হুযূরকেও বেশি করে মিষ্টি খাওয়ান।

মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব হুযূরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, খাওয়ার সময় আপনার প্লেট খালি করে ফেলবেন না। প্লেট খালি দেখলেই আপনার বাঙ্গালী মেজবান আপনার থালায় আরও ভাত দিয়ে ভরে দিবেন! সত্যি বাংলাদেশের লোকেরা খুবই অতিথিপরায়ণ।

মৌলানা আবুল আতা সাহেব যখন বাংলাদেশে যেতেন তখন তিনি উর্দূ ভাষায় ভাষণ দিতেন। পরে একজন অনুবাদক বাংলায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। দেখা যেত যে, মাঝে মাঝে মৌলানা সাহেবের বক্তৃতার সময় অনুবাদক ঘুমিয়ে পড়তেন আর পরে যখন অনুবাদক বলতে শুরু করতেন তিনি নিজের মনের থেকে এত ভাল ভাল কথা বলতে থাকতেন যে তাঁর বক্তৃতা এতই দীর্ঘায়িত হয়ে যেত যে, মৌলানা আবুল আতা সাহেবও ঘুমিয়ে পড়তেন!

সংকলন ও অনুবাদ ঃ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

নবুওয়তের কল্যাণ প্রবাহমান

নবুওয়ত প্রসঙ্গে বিষদ আলোচনায় যাওয়ার আগে নবুওয়ত সম্পর্কে সাধারণভাবে একটা ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক যে, 'নবুওয়ত' কী? মহান আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার প্রতি রহমত না-কি 'লানত'। শিক্ষিত অশিক্ষিত দল মত নির্বিশেষে কেউই 'লানত' কামনা করবে না। বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 'রহমত' কামনা করবে। এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তাআলার এমনি একটি বিরাট রহমতের দরজায় তালা লাগিয়ে নিশ্চিত মনে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেহেশ্‌তে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকা জ্ঞানবানের পরিচয় না কি বোকামির পরিচয় তা ভেবে চিন্তে দেখার বিষয়।

প্রথমে সত্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অলীক ধারণা বা অন্ধ বিশ্বাস নয়। বাস্তবে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর বিশ্বাস। ইসলাম ধর্মে স্বাধীন ও জ্ঞানের দ্বার সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত রেখেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং স্বাধীন চিন্তা-গবেষণাকে প্রোথিত করবার জন্য ধরা-পৃষ্ঠে ইসলামের আগমন হয় নি। পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে" (সূরাতুর রা'দ)। এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদের্শনাবলী রয়েছে" (ঐ)। ইসলাম প্রবর্তক হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "এক প্রহর জ্ঞান বিষয়ে চিন্তা করা সারা বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম"। যাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দেয়া হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞান নিজে কোন কিছু সৃষ্টি করে না। প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত সত্যকে গভীর চিন্তা-গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করে মাত্র। বিজ্ঞানের চিন্তা-গবেষণা জড় জগতের সত্যকে আবিষ্কার করে এবং ধর্মীয় চিন্তা গবেষণা আধ্যাত্মিক জগতের সত্যকে আবিষ্কার করে। একটু তলিয়ে দেখলে অতি সহজেই বুঝা যায় বিজ্ঞান যতই প্রসার লাভ করবে মানুষের জন্য ধর্ম ততই বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

আমরা বিভিন্ন প্রকারে বিশ্বাস করে থাকি। কেউবা দেখে বিশ্বাস করি আবার কেউ বা লোকমুখে শুনে অথবা বই-পুস্তক পাঠ করে বিশ্বাস করি। যেমন, যারা 'লন্ডন' যায় নি তারা লোক মুখে শুনে অথবা বই-পুস্তক পাঠ করে বিশ্বাস করি যে, লন্ডন নামে একটি শহর আছে। তেমনিভাবে সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আগ্রার তাজমহল যারা স্বচক্ষে দেখি নি তারা লোক মুখে শুনে অথবা বই-পুস্তক পড়ে বিশ্বাস করি যে, দিল্লীর অদূরে যমুনা নদীর তীরে পৃথিবীর এককালের সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম তাজমহল অবহিত। এমতাবস্থায় কেউ যদি একথা বলে যে, লন্ডন শহর এবং তাজমহল বলতে পৃথিবীর বুকে কিছু নেই তাহলে বোকামীর পরিচয় হবে না কি? পৃথিবীর বুকে কোটি কোটি মানুষের বাস। কিন্তু জ্ঞানের দিক দিয়ে সকলেই সমান নয়। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন এমন আছেন যারা প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। সবাই যদি সমান হতো তাহলে প্রফেসর ডঃ আব্দুল সালাম, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি নজরুল ইসলাম প্রমুখ জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের মত সবাই নোবেল পুরস্কার পেত না কি? মার্কনী, নিউটন, আইনস্টাইন, এরিস্টটল ইত্যকার অবৈজ্ঞানিকগণ আমাদের মতোই মানুষ কিন্তু জ্ঞানের দিক দিয়ে তারা আমাদের চেয়ে বহু উর্দ্ধে। তাদের কথা আমরা বিশ্বাস করি। যদি তাদের কথা বিশ্বাস না করি তাহলে যান-বাহন কলকারখানার যন্ত্রাদি তৈরী হতো কি? রেডিও টেলিভিশন ইত্যাকার নানাবিধ যন্ত্র যা আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তে নেই তথাপি এগুলিকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। এতকাল যাবত মানুষের ধারণা ছিল যে, চাঁদে কখনো কোন মানুষ যেতে পারে না বা পারবে না। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র কয়েক ব্যক্তি চাঁদে পদার্পণ করে মানুষের সেই ধারণাকে উল্টিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছে,

চাঁদে মানুষ যেতে পারে বা গিয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আমরা তাদের কথা বিশ্বাস করি।

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষকে কেন্দ্র করেই মহান আল্লাহ্‌তাআলা চন্দ্র, সূর্য, আসমান, জমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আসে তৎসমুদয় সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রিয় বান্দাগণ যাতে সুখে শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে পারে তজ্জন্য তাঁর সমুদয় সৃষ্টিরাজিকে মানুষের অধীনে মানুষেরই সেবাকার্যে সর্বদা নিয়োজিত রেখেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয় তোমাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে" (সূরাতুল জাসিয়া)। দিবাভাগে সূর্য আলোক দান করছে। চন্দ্র রজনীযোগে জ্যোৎস্না বিতরণ করছে। বৃক্ষরাজি ফল-ফলাদি এবং অক্সিজেন যোগাচ্ছে। মেঘমালা বারি বর্ষাচ্ছে। আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টিসমূহ নিয়ে একটু চিন্তা-গবেষণা করে দেখলে অতি সহজেই বুঝা যায়, সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই মানুষের কল্যাণে মানুষেরই সেবায় নিয়োজিত আছে। জড় জগতে সূর্য যেমন পৃথিবীকে আলোকিত করছে, সূর্যের আলো বিহনে পৃথিবী হতো অন্ধকারময়। অবিকল এমনিধারা নবুওয়ত আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্‌ ও তাঁর বান্দার সংযোগস্থল আলোকসদৃশ্য। নবুওয়তের দরজা দিয়ে আলোক বিকিরণ হয়ে আধ্যাত্মিক জগতকে আলোকিত করে। উল্লেখ আছে যে, নবুওয়তের দরজা ব্যতীত কেউই ওলী হতে পারে না। আল্লাহ্‌তাআলার হকীকত স্বয়ং আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কেউই যেমন উপলব্ধি করতে পারে না তদ্রূপ নবুওয়তের কল্যাণ যে সৌভাগ্যবানের উপর নিপতিত হয় সেই নবী ভিন্ন অন্য কেউই উপলব্ধি করতে পারে না। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান বই প্রদান করা হয় নি" (সূরাতু বনী ইসরাঈল)। আগেই বলা হয়েছে যে, সকল মানুষের জ্ঞান সমান নয়। কোন পিপীলিকা যদি তার শরীর ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে কোন মইষের চেয়ে শক্তিশালী মনে করে তাহলে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হবে না কি? আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "তিনি যাকে নবীরূপে মনোনিত করেন, তাঁর গুপ্ত বিষয় তাঁর উপর ব্যতীত অন্য কারও উপর অবতীর্ণ করেন না" (সূরাতুল জীন্ন । নবুওয়তের কল্যাণে পৃথিবীর বুকে লক্ষ লক্ষ নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের একই উদ্দেশ্যে ছিল মানুষের নৈতিক চরিত্রকে সুগঠিত করো। মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠিত না হলে আধ্যাত্মিক চরিত্র গঠিত হওয়া সম্ভবপর নয়। নৈতিক চরিত্রের গুণেই অসভ্য এ বর্বর আরব জাতি মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর বুকে উন্নত ও সভ্য জাতির আসনে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছিল। আল্লাহ্‌তাআলা গুপ্ত তত্ত্বের অধিকারী। তিনি যাঁকে নবী বলে মনোনীত করেন তদ্ব্যতীত অন্য কারও নিকট ইহা প্রকাশ করেন না। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ভূত-ভবিষ্যতের কথা দূরে যাক মানুষের কাছে নিজেরই পরিচয় জ্ঞান নেই। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "ওহী ব্যতীত আল্লাহ্‌ মানুষের সাথে কথা বলেন না, অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা তিনি রসূল প্রেরণ করেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন তা তাঁর উপর অবতীর্ণ করেন" (সূরাতুশ শূরা)। নবুওয়ত মানুষের কল্পনার ও ধারণার বহির্ভূত বিষয়। মানুষ এ বিষয়ে তার ক্ষুদ্র জ্ঞানে চিন্তা করতে পারে না। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "বরং যে বিষয়ে তারা জ্ঞান বলে আয়ত্ত করতে পারল না, এবং যে বিষয়ে পূর্ণ ব্যাখ্যা তাদের নিকট আসলো না সে সম্বন্ধে তারা অবিশ্বাস করল" (সূরাতু ইউনুস)। "এবং যখন তারা সে বিষয়ে পূর্ণভাবে জানতে পারবে না তখন বলবে যে, ইহা পুরাতন মিথ্যা" (সূরাতুল আহ্‌কাফ)। নবী রসূলগণ আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে অলৌকিক ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। বর্ণিত আছে যে, "বাহ্য-জ্ঞান তত্ত্ব-জ্ঞানের অন্তরায়।" পুঁথি পুস্তকের বাহ্য-জ্ঞান-তত্ত্ব জ্ঞানের পথে বাধার সৃষ্টি করে। মক্তব মাদ্রাসার বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করে লম্বা জুব্বা জামা ঢিলা পায়জামা ইত্যাদি বেশভূষায় সেজে গর্বে বুক স্ফীত করে বড়াই করে থাকে যে, আমি যা শিখেছি এটা তার বিপরীত। সুতরাং ইহা মিথ্যা। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় যে, আবূ জাহলের উপাধি ছিল আবুল হাকাম অর্থাৎ জ্ঞানীর পিতা। তার সেই বাহ্যিক পুঁথি-পুস্তকের জ্ঞানই সত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে তাকে আবূ জাহল বা মূর্খের পিতায় পরিণত করল। এরূপ দৃষ্টান্ত থেকে সকলেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত নবীর সাহচর্যে যাঁরা অবস্থান করেন তারা নবুওয়ত সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করতে পারেন। তাই দেখা যায়, প্রাথমিকভাবে আল্লাহ্‌ প্রেরিত নবীর প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করেন তাঁদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার অত্যাচার-অবিচার ও নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিত হলেও বিশ্বাসে তারা পর্বতের ন্যায় অচল অটল থাকেন। পরিশেষে বিশ্বাসীগণই বিজয়ীর বেশে ইহকালে এবং পরকালে পুরস্কৃত হন। পৃথিবীর বুকে কত রাজা বাদশা, সম্রাট, শাহানশাহ্‌ গুজরিয়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবী যাদের দাপটে কম্পিত হ'ত। কই কেউতো তাদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে তাদের নামের আগে হযরত এবং নামের শেষে রাযি আল্লাহুআনহু বলে না? অথচ উমাইয়ার কৃতদাস, অশিক্ষিত হাবশী বেলালের নাম শুনলে শাহানশাহ সম্রাটগণের উচ্চ শীর নত হয়ে আসে কেন, ইহা কোন্ সে জ্ঞানের ফল?

"সকলেই জিজ্ঞাসিত হবে কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা কেন এরূপ করলেন সে কথা বলার অধিকার কারো নেই।" মানবকুল শ্রেষ্ঠ হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর আগমনে নবুওয়তের দরজা বন্ধ হয়ে যায় নি। বরং তাঁর (সঃ) গোলামীতে তা নিয়ন্ত্রিত ও প্রবহমান রয়েছে। হযরত রসূল করীম (সঃ) আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য। সেই সূর্য রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অস্তমিত হবে না। জড় জগতের সূর্যের আলোকরশ্মি পেয়ে চন্দ্র যেমন আলোকিত হয়। চন্দ্রের নিজস্ব কোন ক্ষমতা এবং আলো নেই তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর আলোকে আলোকিত হয়ে নবুওয়তের কল্যাণে তিনি অন্ধকারময় আধ্যাত্মিক জগতকে আলোকিত করবেন। তার নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা আলো থাকবে না। নবুওয়ত আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয় বান্দার সাথে সংযোগের দরজা বিশেষ। সেই দরজা কখনও বন্ধ হ'তে পারে না। যে দিন বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন পৃথিবীও লয়প্রাপ্ত হবে। বস্তুতঃ নবুওয়তের কল্যাণ বিশ্ব-নবী সর্দার হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই প্রবহমান রয়েছে।

- সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

আল্লাহ্‌তাআলার 'আযীয' সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ৮ মার্চ, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) বলেন, ঈদুল আযহা থেকে আল্লাহতাআলার গুণ 'আযীয' সম্পর্কে খুতবা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে আগামীতেও খুতবা জারি থাকবে। সূরাতুল আনফালের ১১ ও ১২তম আয়াত ঃ

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝

অর্থ ঃ (স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করছিলে, তিনি তখন তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিলেন (এ ওয়াদার সাথে যে,) 'নিশ্চয় আমি সারিবদ্ধ এক হাজার ফিরিশ্‌তার দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবো। এবং আল্লাহ্ একে তোমাদের জন্য কেবল একটি সুসংবাদ স্বরূপই করেছিলেন যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, অথচ সাহায্য কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

আসলাম আবূ যব্বান (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আমরা রোমানদের একটি শহরে ছিলাম। তারা আমাদের সামনে রোমকদের এক বিশাল সেনাবাহিনী এনে দাঁড় করালো। এর মোকাবেলায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার চেয়ে বড় সেনাবাহিনী বের হলো। মিশরীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন উকবা বিন আমের এবং সমস্ত মুসলিম বাহিনীর সেনানায়ক ছিলেন ফুযায়ল বিন উবায়দ। মুসলমানদের এক ব্যক্তি রোমকদের উপর আক্রমণ চালালেন এবং লড়তে লড়তে তাদের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। তা দেখে মানুষ বলে উঠলো, 'সুবহানাল্লাহ্! এ তো নিজেকে ধ্বংসের কবলে ফেলে দিচ্ছে!' তখন হযরত আবূ আইউব আনসারী দাঁড়ালেন ও বললেন, 'হে ভায়েরা! আপনারা **লা তুলকূ বি আইদিকুম ইলাত্ তাহ্‌লুকাতে** (তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না)- আয়াতটির কী অর্থ করেন? অথচ এ আয়াত আমাদের আনসারদের সম্পর্কে নাযেল হয়েছিল যখন ইসলাম শক্তিশালী হয়ে প্রাধান্যের অধিকারী হবার সৌভাগ্য লাভ করলো এবং বিপুল সংখ্যায় এর সাহায্যকারী বেড়ে গেলো। তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আঁ হযরত (সঃ)-কে না জানিয়ে একে অন্যকে গোপনে বলতে লাগলো, আমাদের ধন-সম্পদ তো বিনষ্ট হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ্‌তাআলা ইসলামকে বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং এর সাহায্যকারী বহুল সংখ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। এখন যদি আমরা আমাদের ধন-সম্পদের সংরক্ষণ করতে লেগে

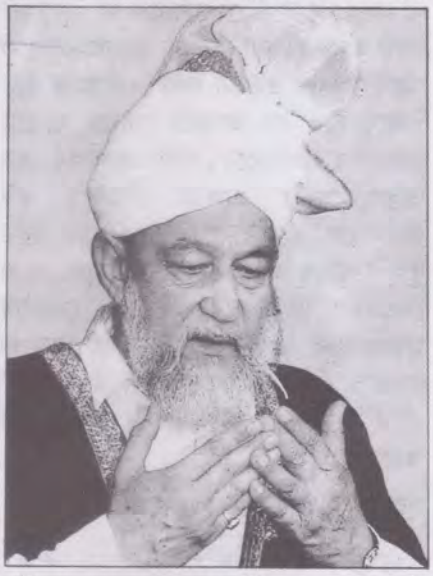

যাই ও তাতে তৎপর থাকি তাহলে যা নষ্ট হয়েছে তার প্রতিকার করতে পারি।" আমাদের এসব কথার জবাবে তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রতি এ আয়াত নাযেল করলেন ঃ **আনফিকূ ফি সাবীলিল্লাহি ওয়ালা তুলকূ বিআইদীকুম ইলাত্ তাহ্‌লুকাতে** - আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর ও নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ছুঁড়ে দিও না। অতএব আত্‌তাহলুকাহ্ (ধ্বংস)-এর দ্বারা ধন-সম্পদ নিয়ে আমাদের মশগুল হয়ে পড়া এর পেছনে লেগে থাকা আর আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ ও গায্‌ওয়ায় অংশগ্রহণকে এড়িয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছিল।' হযরত আবূ আইউব এরপর সর্বদা জেহাদে শামিল হতে থাকেন, এমন কি অবশেষে রোমানদের দেশে (কনস্ট্যান্টিনোপলে) শাহাদত বরণ করে সেখানে সমাহিত হন।

সূরা আনফালের ৫০তম আয়াত ঃ

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

অর্থ ঃ (স্মরণ কর) যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলতে লাগলো, 'এদেরকে (অর্থাৎ মু'মিনদেরকে) এদের ধর্ম ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। অথচ যে কেউ আল্লাহ্‌তে ভরসা করে সে ক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

আবূ উসমান আন্নাদী বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রাঃ) একবার যখন খুতবা ইরশাদ করছিলেন আমি তাঁর মেম্বরের কাছেই বসা ছিলাম। খুতবা দিতে গিয়ে তিনি বললেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন, "আমার এই উম্মত সম্পর্কে প্রত্যেক এমন মুনাফিক সম্বন্ধে আমার ভয়, যে মুখ (কথা) চালাতে খুবই দক্ষ।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'মুনাফিকের দৃষ্টান্ত সেই বকরীর ন্যায় যা দু'টি পালের মাঝে ফিরে বেড়ায়। কখনও এ পালে চলে যায়, আবার কখনও ওপালে চলে যায়। কিছুই বুঝা যায় না সে আসলে কোন্ পালের।'

হযরত আমর বিন দান্নার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'একবার আমরা গায্‌ওয়ায় (যুদ্ধ অভিযানে) শামিল ছিলাম। সুফিয়ান বলেন, 'ঐ গায্‌ওয়া যথাসম্ভব বনী মুস্তালিকের গায্‌ওয়া ছিল। তা চলাকালীন এক সময়ে মুহাজিরীনের কোন একজন আনসারের মধ্যে এক ব্যক্তিকে তার কোমরে আঘাত করে বসে। (আঘাতকারী) ঐ মুহাজির ডাক দিল, 'হে মুহাজিরীন! তোমরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আস।' এবং ঐ আনসারীও সাহায্যের জন্য আনসারকে ডাকলো। নবী করীম (সঃ) তা দেখে বললেন, 'কী এসব অজ্ঞতার ব্যাপার ঘটছে?' সাহাবায়ে কিরাম জানালেন যে, একজন মুহাজির একজন আনসারীর পিঠে আঘাত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন,

এসব অজ্ঞতার কাজ ছেড়ে দাও, শরীয়তে এগুলি অপসন্দনীয়।' একথা (মুনাফিকদের সরদার) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালূল শুনে বলতে লাগলো, 'এরা কি সত্যিই এরূপ করেছে? খোদার কসম! যখন আমরা মদীনায় ফিরে যাব, তখন সব চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বের করে দিবে।' এতে হযরত উমর (রাঃ) নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিককে মেরে ফেলি।' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও, যাতে লোকে একথা না বলে যে, মুহাম্মদ তার নিজের সাথীদেরকেই হত্যা করছেন'। আমর (রাঃ) বর্ণীত আর একজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালূলের পুত্র আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ তাকে (অর্থাৎ তার পিতাকে) বললো, 'তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়ী ফিরে যেতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বীকার কর যে, তুমি সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সবচেয়ে সম্মানিত।' মোট কথা, তাকে তা স্বীকার করতে হলো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "নিফাক (কপটতা) আমাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় গোনাহ্। রিয়া (লোক দেখানো) সব কাজের চেয়ে বেশি মারাত্মক এবং যালিম ও মুশরিকদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত।" তিনি আরও বলেন, "আমি নিশ্চিতভাবে জানি, রিয়া ও তোষামোদকারীরা মুনাফিক হয়ে থাকে। খোদার ফযলে আমি নিফাক ও কপটতা দূর করার জন্য এসেছি।" তিনি আরও বলেন, "মুনাফিক কেবল সে-ই নয় যে, অঙ্গীকার রক্ষা করে না আর মুখে আন্তরিক নিষ্ঠা প্রকাশ করে কিন্তু তার অন্তরে কুফ্রী (অস্বীকার) থাকে। বরং সে-ও মুনাফিক, যার স্বভাবে দ্বৈততা ও স্ববিরোধ রয়েছে যদি তা কিনা তার প্রাকৃতিক ক্ষমতার বাইরে না হয়ে থাকে। সাহাবা-এ-কিরাম স্ববিরোধিতা খুবই ভয় করতেন। একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কাঁদছিলেন দেখে হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদো?' তিনি বললেন, 'আমার মধ্যে স্ববিরোধিতা আছে বলে আমি অনুভব করি। (কেননা) যখন আমি নবী করীম (সঃ)-এর নিকটে থাকি তখন মন নরম ও এর আলাদা এক অবস্থা হয়ে থাকে কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সরে গেলে সে অবস্থা আর থাকে না।' হযরত আবূ বকর (রাঃ) বল্লেন, সে একই অবস্থা তো আমারও' তারপর উভয়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট গেলেন ও সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি (সঃ) বললেন, 'তোমরা মুনাফিক নও। মানুষের অন্তরে জোয়ার ভাটা হয়ে থাকে। যে অবস্থা তোমাদের আমার কাছে থাকায় হয়ে থাকে তা যদি সবসময় থাকতো, তাহলে ফিরিশ্তারা সবসময় তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে থাকতো।' এখন লক্ষ্য কর, সাহাবা-এ-কিরাম এই নিফাক বা স্ববিরোধ স্বভাবকে কতো ভয় করতেন। যখন মানুষ দুঃসাহসী হয়ে (অন্যায়ভাবে) সমালোচনামুখর হয় তখনও মুনাফিক হয়। আর যেখানে ধর্মের অবমাননা করা হয় এমন বৈঠক যদি সে ত্যাগ না করে অথবা তাদেরকে জবাব না দেয় তাহলেও সে মুনাফিক হয়ে যায়। যদি মু'মিনের মধ্যে আত্মাভিমান বোধ ও ইস্তিকামত (দৃঢ়তা) না থাকে তাহলেও সে মুনাফিক হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ প্রত্যেক অবস্থায় খোদাতাআলাকে স্মরণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত নিফাকমুক্ত হতে পারবে না। সে অবস্থাটি দোয়ার মাধ্যমে তোমাদের হাসিল হবে। সর্বদা দোয়া কর, যেন আল্লাহ্তাআলা এথেকে বাঁচান। এই সিলসিলায় প্রবেশলাভের পরও যদি কেউ দু'মুখী স্বভাব অবলম্বন করে তা হলে সে এ সিলসিলাহ্ থেকে দূরে সরে যায়। সেজন্যই মুনাফিকদের জায়গা খোদাতাআলা দোযখের সবচেয়ে নিম্নস্তরে **'আদ্দারকিল আস্ফালে'** রেখে দিয়েছেন। কেননা এদের মধ্যে দু'মুখী স্বভাব থাকে।"

সূরা আনফালের ৬৪তম আয়াত ঃ

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٤﴾

অর্থ ঃ "এবং তিনি তাদের অন্তরকে পরস্পর বেধে দিয়েছেন; যদি তুমি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই ব্যয় করে দিতে তবুও তুমি তাদের অন্তরকে পরস্পর বাঁধতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ই তাদের অন্তরকে পরস্পর বেঁধে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি সর্বময় প্রাধান্যের অধিকারী, পরম প্রজ্ঞাবান।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্তাআলার উদ্দেশ্যে যারা একে অন্যকে ভালবাসে তারা জান্নাতে যেসব বালাখানা পাবে সেগুলো দেখতে অতি উজ্জ্বল তারকার ন্যায় হবে যা পূর্বদিকে উদিত হয়, অথবা (হয়তো তিনি বলেছিলেন, পশ্চিম দিকে উদিত হয়)। বলা হবে, এরা কারা? উত্তরে বলা হবে, এরা মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালবাসতো'।

হযরত খলীফা আওওয়াল (রাঃ) বলেন, "ঐশী অনুগ্রহ ও আশিস অনেক রকমের হয়ে থাকে। একা একজনের ওপরে সেই আশিস ও অনুগ্রহ হয় না যা দু'জনের মিলে যাওয়াতে হয়ে থাকে। এর একটি দৃষ্টান্ত এভাবে আছে, যেমন স্বামী ও স্ত্রী যদি আলাদা আলাদা থাকে আর তারা সেই আশিস ও ফযল লাভ করতে চায় যা সন্তানের আকারে হয়ে থাকে তাহলে তা হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা একত্র হয়ে সন্তান লাভের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ম-বিধি পালন করে। তেমনি বিরাট এক জামাতের ওপর যে ঐশী-অনুগ্রহ ও ফযল হয়ে থাকে তা মাত্র কয়েকজনের জামাতের ওপরে হ'তে পারে না। একটি ঘরের আরাম ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ফযল যদি কেউ লাভ করতে চায় তাহলে তা তখনই সম্ভব হবে যখন কাজের লোক সমেত নাওয়া ধোয়া শোয়া খাওয়া পরার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত আলাদা আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা থাকে। তেমনিভাবে যদি উন্নতি লাভ করে এগিয়ে যেতে চাও তাহলে অনুরূপ বাদশাহাত ও রাজত্বের কাঠামো সম্পর্কে অনুমান করে নিতে পারে। এ থেকে ফল এই দাঁড়ায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের মাঝে এক ধরনের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও তোমরা একে অন্যের উপকার করার চেষ্টায় লেগে থাক, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঐ মহান ফযল ও আশিসকে লাভ করতে পারবে না যা একটি বিরাট জামাতের লাভ হয়ে থাকে। ঐক্যের যে রূহ্ (প্রেরণা) সাহাবা-এ-কিরামের মাঝে ফুঁকে দেয়া হয়েছিল তাকে আল্লাহ্তাআলা তাঁর ফযল ও অনুগ্রহ বলে অভিহিত করেছেন। এ উদ্দেশ্য সফলের জন্য চাই পরস্পরের মাঝে যেন থাকে ধৈর্য, নম্রতা ও সহিষ্ণুতা। যদি তা না থাকে আর একটু -আধটু কথায় যদি তোমরা একে অন্যের প্রতি মুখ মলিন কর তাহলে এর ফলে হবে বিভেদ-বিভক্তি।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) আরও বলেন, "দেখ, দু'জনকে (ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত) একপ্রাণ করে দেয়াও যেখানে

অনেক কঠিক কাজ সেখানে হাজার হাজার মানুষকে একই পথে একত্র করা ও তাদের মাঝে ঐক্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়া খোদাতাআলার অনুগ্রহ ছাড়া কী ক'রে সম্ভব? দেখ, তোমরা খোদাতাআলার অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেছ। কাজেই এ নেয়ামতের কদর কর, এবং এর মর্যাদাকে বুঝো ও চিনো এবং আন্তরিক নিষ্ঠা ও দৃঢ়পদক্ষেপকে পথের মশাল বানাও।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "মনে রেখো, হৃদয়গুলোকে পরস্পর বেঁধে দেয়া হচ্ছে এক রকম অলৌকিকতা। স্মরণ রেখো, তোমাদের মধ্যে কেউই যেন এমন না হয় যে, সে নিজের জন্য যা পসন্দ করে তা সে তার ভাইয়ের জন্য পসন্দ করে না। কেউ ওরূপ হলে সে আমার জামাতভুক্ত নয়। সে বিপদ-বালাইয়ের মুখে রয়েছে। তার পরিণতি ভাল নয়। আমি এক বই বানাবো। তাতে ওরূপ লোকদেরকে (অন্তর্ভুক্ত ক'রে) আলাদা করে দেবো যারা তাদের ভাবাবেগকে সংযত করতে পারে না। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে লড়াই হয়ে থাকে। যেমন কেউ বলে, খেলাড়ী বাজিকর দশ গজ উঁচু লাফ দিয়েছে। অন্যে আবার তার চেয়েও বাড়িয়ে বলে। এভাবে আবার তাদের মধ্যে আক্রোশ ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। মনে রেখো, হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যাওয়া মাহ্দীর আলামতের অন্তর্ভুক্ত। সে আলামত কি পূর্ণ হবে না? নিশ্চয়ই হবে। তোমরা কেন ধৈর্য ধর না? চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটি তত্ত্ব হচ্ছে, কোন রোগের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সমূলে নির্মূল করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রোগ দূর হয় না। আমার অস্তিত্ব থেকে ইন্শাআল্লাহ্ এক সালেহ্ (নিষ্ঠাবান) জামাত সৃষ্টি হবে। পরস্পর শত্রুতার কারণ বা হেতু কী? কৃপণতা সংকীর্ণতা জিদ অহংকার আত্মম্ভরিতা ও আবেগ উত্তেজনা। আমি জানিয়ে দিয়েছি অচিরেই এক পুস্তক রচনা করবো আর ঐ সমস্ত লোককে জামাত থেকে পৃথক করে দিবো যারা আবেগ উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না। তারা এমন যে, স্মরণ রাখবেন, তারা কেবল কয়েক দিনের মেহ্মান।"

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অবশ্য ওরূপ কোন পুস্তক রচনা তো করেন নি যাতে নাম দিয়ে ঐ সকল লোকের উল্লেখ করা হয় যে, তারা তাঁর জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে কিশ্তি-এ-নূহ পুস্তকে এরূপ শিক্ষা দিয়েছেন যা এতো কঠিন (উঁচু মানের) যে, প্রত্যেকে যে তা শোনে (বা পড়ে) সে মনে করে, সে-ও জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা তা শিক্ষার চূড়ান্ত উচ্চমান।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "আমাদের পূর্ণতম পথপ্রদর্শক (সল্লাল্লাহুঃ)-এর সাহাবীগণ নিজেদের খোদা ও রসূলের জন্য কতো না আত্মোৎসর্গ করেছেন! স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, বহু বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছেন। প্রাণ দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে কদম কেবল আগেই বাড়াতে থাকেন। অতএব তা কী বিষয় ছিল যা তাদেরকে এমন আত্মোৎসর্গীকৃত করে দিয়েছিল? তা ছিল সেই ঐশী প্রেমের আতিশয্য যার আলোকচ্ছটা তাদের হৃদয়ে পতিত হয়েছিল। অতএব যে কোন নবীর সাথে তুলনা করা হোক তিনি (সঃ) তাঁর আদর্শ, শিক্ষা ও পবিত্রকরণ শক্তির দ্বারা গড়ে তোলা তাঁর অনুসারীদের প্রতি অন্যদেরকে এতো বৈরী করে তোলা সত্ত্বেও বীরত্বের সাথে সত্যের পথে প্রত্যেক বিপদের মুখে তাদের নিজেদের রক্ত ঝরিয়ে দেয়ার কোন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ মাকাম ও মর্যাদাই ছিল আঁ হযরত (সঃ)-এর সাহাবা-এ-কিরামের। তাঁদের হৃদয়কে যে কতো গভীর ভালোবাসায় পরস্পর বেঁধে দেয়া হয়েছিল (কুরআন করীমে) তা বড়ই জোরে শোরে মাত্র দু'টি বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ ওয়া **আল্লাফা বাইনা কুলুবিহিম ওয়া লাও আন্ফাক্তা মা ফিল্ আরযি জামীয়াম মা আল্লাফ্তা বাইনা কুলুবিহিম** অর্থাৎ তাদের হৃদয়কে যে গভীর ভালবাসায় পরস্পর বেঁধে দেয়া হয়, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সোনার পাহাড় ব্যয় করে দিয়েও তা করা কখনও সম্ভব হতো না।"

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরও বলেন ঃ "কেউ কি চিন্তা করতে পারে এমন ফিরাউন স্বভাবের এক জাতি পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হবে ও খোদাতাআলার সাথে এমন ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ হবে যে, তারা তাঁর (সঃ) আনুগত্যে এরূপ আত্মহারা হয়ে পড়বে যে, তাদের মূল্যবান জীবন পর্যন্ত তাঁর পথে বিলিয়ে দেবে? ভেবে দেখ, এটা কি কোন সহজ ব্যাপার ছিল। এরূপ জাতির মধ্যে এমন ঐশী প্রেম ফুঁকে দেয়া যে, তাঁরা জীবন বাজি রেখে সত্যের পথে সংগ্রাম-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এটা আঁ হযরত (সঃ)-এরই এক অনন্য সাধারণ সাফল্য ছিল যা স্বয়ং তাঁর অতি উঁচু স্তরের 'কুওয়াতে কুদসীয়া' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবকে সুস্পষ্ট করে দেখায়।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা তো শিশু-সুলভ খেলা মাত্র। আজ দুনিয়া জুড়ে যে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে আছে তা তাদের ভেতর থেকে না তো বের করে দিতে পারি, আর না তাদের মাঝে পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি করে দিতে পারি, যার দরুন তারা সকলে এক ও অভিন্ন অস্তিত্বের ন্যায় হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহ্তাআলার কাজ। সুতরাং কুরআন করীমে সাহাবা-এ-কিরামের সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলা বলেন ঃ **হুয়াল্লাযী আইয়াদাকা বিনাস্রিহি ওয়া বিল্মু'মিনীনা ওয়া আল্লাফা বাইনা কুলুবিহিম ওয়া লাকিন্নাল্লাহা আল্লাফা বাইনাহুম ইন্নাহুল্ আযীযুল্ হাকীম**- তিনিই (আল্লাহ্) যিনি তাঁর (বিশেষ) সাহায্যের দ্বারা ও মু'মিনদের দ্বারা তোমাকে সমর্থন দান করেছেন এবং তাদের হৃদয়ে এমন ভালবাসা ঢেলে দিয়েছেন যে, তুমি যদি সারা জগতের ভান্ডার বিলিয়ে দিতে, তবুও এই ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারতে না যা আল্লাহ্ তাদের মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন, নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান। যিনি এ কাজ যেমন পূর্বে করেছেন, তেমনি এখনও করতে পারেন। ভবিষ্যতে তাঁরই ওপর ভরসা ও প্রত্যাশা। যে কাজ অবশ্যই হবার হয়, তাতে খোদাতাআলার ফযলের রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। যেমন মালি তার বাগানে পানি সিঞ্চন করে। তাতে তার বাগান সজীব হয়ে ওঠে। তেমনি খোদাতাআলা তাঁর প্রেরিতদের সিলসিলা ও জামাতকে উন্নতি ও সজীবতা দান করে থাকেন। যে সব ফির্কা (দল ও সম্প্রদায়) কেবল মানবীয় প্রচেষ্টায় তৈরী হয় তাদের মাঝে মাত্র কয়েক দিনেই অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন কিনা ব্রাহ্মসমাজীরা উঠেছিল। তারপর অল্প কিছুদিন উন্নতি লাভ করার পর অবশেষে তা রুখে গেল, আর দিনে দিনে তারা বিলীন হয়ে চলেছে। এ জাতীয় লোকদের ভিত্তি কেবল মানবীয় অনুমানপ্রসূত ধ্যান-ধারণার উপর হয়ে থাকে।"

সূরা আল্-আন্ফালের ৬৮তম আয়াত ঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٨﴾

অর্থঃ কোন নবীর জন্য পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করা ব্যতিরেকে বন্দী বানানো বৈধ নয়; তোমরা দুনিয়ার সম্পদ চাও, অথচ আল্লাহ্ পরকাল পসন্দ করেন, আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কে রসূল করীম (সঃ) সাহাবাকে বললেন, 'এই কাফির কয়দীদের সম্পর্কে তোমাদের রায় কী?' এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ বকর (রাঃ) নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল! এ লোকগুলো আপনার জাতি (জ্ঞাতি-গোষ্ঠী) ও নিকট-আত্মীয়। এদেরকে জীবিত থাকতে ছেড়ে দিন। এদের প্রতি ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করুন। হয়তো এদের তওবা কবুল ক'রে আল্লাহ্ এদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।' হযরত উমর (রাঃ) বললেন, 'এরা আপনাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছে, আপনাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছে। এদের মুণ্ডপাত করুন।' আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা নিবেদন করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! এমন কোন উপত্যকা তালাশ করুন যেখানে পর্যাপ্ত জ্বালানী মজুদ থাকে। তারপর সে উপত্যকা ফেলে দিয়ে তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলুন।' হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'তুমি আত্মীয়-সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিচয় দিচ্ছ'। এ সকল পরামর্শ শোনার পর আঁ হযরত (সঃ) ঘরে চলে গেলেন। কোন উত্তর দিলেন না। এরপর মানুষে বলতে লাগলো, 'তিনি (সঃ) আবূ বকরের রায় গ্রহণ করবেন।' কেউ কেউ বললো, 'উমরের রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন।' আর কেউ কেউ বললো, 'হুযূর (সঃ) আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার পরামর্শ অনুযায়ী করবেন।' কিছুক্ষণ পর আঁ হযরত (সঃ) সবার সামনে উপস্থিত হয়ে ইরশাদ করলেন, "কোন কোন মানুষের হৃদয়কে আল্লাহ্তাআলা তাঁর পথে এত নরম করে দেন যে, তারা দুধের চেয়েও বেশি নরম হয়ে যায়, আর কারও কারও হৃদয়কে তাঁর পথে এত শক্ত করে দেন যে, তারা পাথরের চেয়েও কঠিন হয়ে যায়। হে আবূ বকর! তোমার দৃষ্টান্ত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায়। যিনি বলেছিলেন ঃ **ফামান তাবে' আনী ফা-ইন্নাহু মিন্নি ওয়া মান আসানী ফা-ইন্নাকা গফূরুররহীম** (সূরাতু ইব্রাহীম ঃ ২৭)। এবং তোমার দৃষ্টান্ত ঈসা (আঃ)-এর মত-ও। যিনি বলেন ঃ **ইন তুআয্যিবহুম ফা-ইন্নাহুম ইবাদুকা ওয়া ইন তাগ্ফির লাহুম ফা-ইন্নাকা আযীযুল হাকীম** (সূরাতুল মায়েদা ঃ১১৯)। আর হে উমর! তোমার দৃষ্টান্ত নূহ্ (আঃ)-এর ন্যায়। যিনি বলেছিলেন ঃ **রাব্বে লা তাযার আলাল আরযি মিনাল কাফিরীনা দাইয়ারা** (সূরাতু নূহ্ ঃ ২৭)। তেমনি তোমার দৃষ্টান্ত মূসা (আঃ)-এর ন্যায়। যিনি বলেছিলেন ঃ **রব্বানাত্মিস্ আলা আমওয়া লিহিম ওয়াশ্দুদ আলা কুলুবিহিম ফালা ইউমিনূ হাত্তা ইয়ারাউল আযাবাল আলীম** (সূরাতু ইউনুস ঃ ৮৯ - অনুবাদক)।' এরপর আঁ হযরত (সঃ) বলেন, 'যেহেতু তোমরা এখন অভাবগ্রস্ত, সেজন্য বন্দীদের মধ্যে যেন এমন কেউ না বাঁচে (বাদ না পড়ে), যে হয়তো ফিদিয়া (মুক্তিপণ) পরিশোধ করে মুক্ত হোক, নতুবা তাকে মুণ্ডপাত করা হোক।' আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি বললেন, 'হায়স বিন বায়যা ব্যতীত। কেননা আমি তাকে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়ার কথা বলতে শুনেছি।' তাতে আঁ হযরত (সঃ) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। তখন আমি এত ভয় পাই, আর ভয় আমাকে এতো আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, আমার জীবনে কখনও আমি ওরকম ভয় পাই নি। আমার মনে হতে লাগলো যেন আকাশ থেকে আমার ওপর পাথর বর্ষিত হতে আরম্ভ করবে। এরই মধ্যে আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'ঠিক আছে! হায়স বিন বায়যা ব্যতীত।' রিওয়ায়াতকারী বলেন যে, তখনই এ আয়াত ও এর পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করা হলো ঃ **মা কানা লি-নাবীয়েন আইঁ ইয়াকূনা লাহু আস্রা হাত্তা ইউস্খিনা ফিল আরয্ তুরীদূনা আরাযাদ্ দুনিয়া ওয়াল্লাহু ইউরীদুল আখিরা ওয়াল্লাহুল আযীযুল হাকীম** (সূরা আনফাল ঃ৬৮)।

সূরাতুত্ তাওবাহ্-এর ৭১তম আয়াত ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

অর্থ ঃ মুমিন পুরুষরা ও মু'মিন মহিলারা একে অন্যের সহায়ক বন্ধু, তারা ভাল কথার আদেশ দেয় ও খারাপ বিষয় থেকে বারণ করে আর নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের প্রতি দয়া করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ বলেন, 'মু'মিনদের দৃষ্টান্ত এমন অট্টালিকার ন্যায় যার একাংশ অপর অংশকে মজবুত করে।'

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মস্উদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন। 'তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য ও সহায়তা লাভ করবে এবং তোমাদের লক্ষ্য স্থলে পৌঁছে যেতে সফল হবে ও তোমাদেরকে বিজয়সমূহ অর্জনের সৌভাগ্য দান করা হবে।

অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঐ যুগ দেখতে পায় সে যেন (তখন বিশেষভাবে) তাকওয়া অবলম্বন করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করে। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ জেনে শুনে আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে সে আগুনে তার স্থান তৈরী করবে।'

আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র সহধর্মিনী উম্মে হাবীবা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেন, "সৎকাজের আদেশ দেয়া, মন্দ কাজ থেকে বারণ করা ও খোদাতাআলার যিক্র করা ছাড়া আদম সন্তানের জীবনের অন্য সব কোলাহল তার বিপক্ষেই যাবে, পক্ষে নয়।"

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "নিজেদের ভেতর পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি ও ভালবাসা সৃষ্টি কর। হিংস্রতা ও বিভেদ ছেড়ে দাও। প্রত্যেক প্রকারের অহেতুক কথা ও বিদ্রূপ-পরিহাস থেকে সরে পড় যা মানুষের অন্তরকে সত্য থেকে সরিয়ে দিয়ে কোথা হতে কোথায় (দূর-দূরান্তে কোথাও) পৌঁছিয়ে দেয়। আপষে একে অন্যের প্রতি সম্মান দেখাও। স্মরণ রেখো, আল্লাহ্তাআলার ফরমানের অধীনে যদি নিজেদেরকে নিয়োজিত কর ও তাঁর ধর্মের সাহায্য-সমর্থনে তৎপর হয়ে পড়, তাহলে তিনি সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে দিবেন এবং তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে। তোমাদের উচিত, যেন খোদাতাআলার

প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, যাতে কোন মহামারী বা অন্য কোন আপদের পক্ষে তোমাদের উপর হাত দেয়ার সাহস জন্মাতে না পারে। কোন কিছুই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া ঘটতে পারে না। প্রত্যেক প্রকারের ঝগড়া-বিবাদ ও জোশ-উত্তেজনাকে নিজেদের ভিতর থেকে উঠিয়ে দাও। কেননা এখন এরূপ এক সময় যখন তোমরা যেন ছোট ছোট বিষয়কে উপেক্ষা ক'রে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান কাজগুলোতে মশগুল হয়ে যাও।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "ইয়ামুরুনা বিল মা'রূফে ওয়া ইয়ান্‌হাওনা আনিল মুনকার হচ্ছে মু'মিনদের শান ও মর্যাদা। তবে (অন্যকে) ভাল কাজের আদেশ দেয়ার ও খারাপ কাজ থেকে বারণ করার আগে নিজের আমলি (ব্যবহারিক) অবস্থার দ্বারা এটা প্রমাণ করে দেখানো আবশ্যকীয় হয়ে থাকে যে, সে নিজে ঐ শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী, কেননা অন্যের ওপর নিজের প্রভাব ফেলার আগে) নিজের অবস্থাকে তো প্রভাবশালী বানাতে হবে। অতএব মনে রেখো, ভালো কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করা থেকে মুখ কখনও বন্ধ রাখবে না। তবে স্থান-কাল-পাত্র বিশেষের সনাক্ত করাও আবশ্যকীয়। বলার ভঙ্গী এমন হওয়া চাই যেন তা নরম হয় ও তাতে প্রাঞ্জলতা থাকে।"

তিনি (আঃ) আরও বলেন, "আমার উপদেশ এই যে, দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখো ঃ এক, খোদাতাআলাকে ভয় করো। দুই, নিজেদের ভাইদের প্রতি সেরূপ সহানুভূতি দেখাও যেরূপ নিজের প্রতি দেখিয়ে থাক। যদি কারও কোন ভুল -ত্রুটি হয়ে যায় তাকে ক্ষমা করা উচিত। এমন বেশি জোর দেয়াও উচিত নয়, যাতে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।" অতঃপর হুযূর (আঃ) বলেন, "যে কেউ মন্দের দ্বারা মন্দের মুকাবিলা (প্রতিরোধ) করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। দুষ্ট-দুর্জনের আক্রমণ থেকে অবশ্য নিজেকে বাঁচাও, কিন্তু নিজে কখনও দুষ্কৃতকারীসুলভ মুকাবিলা করো না। (তবে) যে ব্যক্তি কাউকে (চিকিৎসা স্বরূপ) এমনভাবে ঔষধ দেয় যাতে সে ভাল হয়ে যায়, সে তার জন্য (প্রকৃতপক্ষে) পুণ্য করে। ওরূপ ব্যক্তির সম্পর্কে আমরা বলি না যে, সে মন্দের দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করেছে। প্রত্যেক পাপ ও পুণ্য নিয়্যত থেকেই সৃষ্টি হয়। অবশ্যই তোমাদের নিয়্যত যেন কখনও অপবিত্র না হয়, বরং তোমরা যেন ফিরিশ্‌তাদের ন্যায় হয়ে যাও।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরও বলেন, "আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন নির্মল অন্তরে পবিত্র ও সরল নিয়্যতে একে অন্যের সহায়ক হয়ে যাই এবং দীন ও দুনিয়ার সংকট ও সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাই এমন সহানুভূতি যে, আমরা যেন একে অন্যের অঙ্গ-প্রতঙ্গস্বরূপ হয়ে যাই। ঐ ধর্ম ধর্মই নয় যাতে সাধারণভাবে (সবার প্রতি) সহানুভূতির শিক্ষা নেই। সে মানুষ মানুষ নয় যার মধ্যে সহানুভূতির গুণ নেই। ঐশী প্রকৃতি ও গুণাবলী আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়, আমরাও যেন মানবজাতির প্রতি উদার আচরণের পরিচয় দেই, কখনও সংকীর্ণমনা না হই। এ পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি সর্বকালের সকল মহাপুরুষ এ সাক্ষ্য দিয়ে এসেছেন যে, খোদাতাআলার গুণাবলীর অনুসরণ ও অনুকরণ মানব জাতির স্থিতিশীল জীবনের জন্য আবে হায়াত (অমৃত সুধা) ও শান্তির উৎসস্বরূপ। কেননা আল্লাহ্‌তাআলার পবিত্র গুণাবলীর অনুকরণের উপরই মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভরশীল।"

অতঃপর সূরাতু ইব্রাহীমের ২য় আয়াত ঃ

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ﴿۲﴾

অর্থ ঃ আলিফ-লাম-রা (আনাল্লাহু আরা– আমি আল্লাহ্ দেখি), এ এমন একটি কিতাব যা আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে মানুষকে আঁধার থেকে বের করে আলোর দিকে এনে সেই পথে নিয়ে যাও যা মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান (আল্লাহ্)-এর পথ।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "এই মহা মর্যাদাপূর্ণ কিতাব আল্লাহ্ এজন্য অবতীর্ণ করেছেন আয়াতটিতে এ দিকে ইঙ্গিত (বহন করে) যে, মানুষের মনে যত প্রকারের ওসওসা ও সন্দেহ-সংশয়ের উদয় হয় ওসবই কুরআন করীম দূর করে ও সব রকম কুধারণাকে নির্মূল করে এবং পরিপূর্ণ ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি দান করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আবশ্যকীয় সকল প্রকার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব দান করে।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউওয়াল (রাঃ) বলেন, "এখানে আঁ হযরত (সঃ)-কে আঁধার থেকে আলোর দিকে আনয়নকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের এক সময় এমন অতিবাহিত হয় যখন নবী করীম (সঃ)-এর হিতোপদেশ তাকে আঁধার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যাবার কারণ হয়। কিন্তু আরেক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ **আল্লাহু ওলীউল্লাযীনা আমানূ ইউখরিজুহুম মিনায্ যুলুমাতি ইলান্ নূর** (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ২৫৮)।" অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) অত্যন্ত গভীর এক সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন যে, এক জায়গায় তো নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি আঁধার থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেন। অন্যদিকে আল্লাহ্ নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজে আঁধার থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেন। অতএব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল বলেন, 'আল্লাহ্ নিজে যা করেন সে কাজ-ই আবার আঁ হযরত (সঃ)-ও করেন বলে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়টি লক্ষণীয়। হযরত জিব্রাঈল নবী করীম (সঃ)-এর নিকট মানুষকে ধর্ম শিখাবার জন্য আসেন। আর প্রথম প্রশ্নটি এ-ই করেন, **ইয়া মুহাম্মাদু আখবেরনি আনেল ইসলাম**। ইসলাম হচ্ছে আজ্ঞানুবর্তিতার অপর নাম। সারা জাহানের জন্য তো সুযোগ নেই যে, সবাই আল্লাহ্‌র কথা শুনতে পারতো। কাজেই প্রথমে নবী শোনেন। তারপর অন্যান্যদেরকে শোনান। অতএব প্রথম স্তর তো এই যে, মানুষ যেন নবীর সাহচর্যে থাকে এবং তাঁর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার মাধ্যমে তাঁর কাছে শিখে। সুতরাং নবী করীম (সঃ)-এর নিকট মানুষ আসতো ও তাঁর কথা শুনতো। তারপর ক্রমাগতভাবে ওই সকল কথা ধীরে ধীরে অন্যান্য জায়গায়, অপরাপরের নিকট পৌছে যেতো। আর এভাবে তারা ইসলাম থেকে ঈমানের মর্তবা লাভ করতো। এভাবে তাদের অনেকে আঁধার থেকে বেরিয়ে আলোর দিকে এসে যেতো। প্রথম আঁধার তো কাফিরদের বৈঠক মজলিস ছিল। তা ছেড়ে তারা নবী করীম (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আলোতে এসে যেতো।"

অনুবাদ ঃ মাওলানা **আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্‌ফর আহমদ, রাবওয়া

(দশম কিস্তি)

♦ হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভান্ডারের কথা বলবো না? আমি বল্লাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)! অবশ্যই বলুন। তিনি (সঃ) বল্লেন, তাহলো ঃ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔ (مسلم کتاب الذکر)

(লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম- মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র)।

অর্থ ঃ কেবল মাত্র আল্লাহ্‌রই শক্তি ও সামর্থ্য আছে, যিনি অতি উচ্চ ও মহান।

♦ হযরত মু'আয বিন জাবাল বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযে, আর অন্য একটি বর্ণনানুযায়ী প্রত্যেক নামাযের পড়ে, এ দোয়া পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ۔ (ابوداؤد کتاب الصلوة)

(আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিক্‌রিয়া ওয়া শুকরিয়া ওয়া হুস্‌নি 'ইবাদাতিক- আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সলাত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার স্মরণ ও শোকর করার জন্যে আমাকে সাহায্য করো। আমাকে তোমার ইবাদতকে সুন্দরভাবে করার সৌভাগ্য দাও।

♦ হযরত মুসলিম তাইমী (রাঃ)-কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উপদেশ দেন, ফজরের নামায ও মাগরিবের নামাযের পর ৭ বার করে এ দোয়া পাঠ করো তাহলে তোমার আগুনের শাস্তি থেকে আশ্রয় লাভ হবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ۔ (ابوداؤد کتاب الادب)

(আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার- আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে আগুন থেকে রক্ষা করো।

দোয়ায় আবেগ সৃষ্টির জন্যে দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) তাঁর পিতা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ، تَشْفِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوْفِ الدُّمُوْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ، قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ الدُّمُوْعُ دَمًا، وَالْاَجْرَاسُ جَمْرًا۔

(کتاب الدعاء جلد ۳ صفحہ ۱۴۸۰ از علامہ طبرانی ۳۶۰ھ مطبوعہ بیروت)

[আল্লাহুম্মার যুক্বনী 'আইনায়নি হাত্ত্বালা-তায়নি তাশফিয়ানিল্ ক্বালবা বিযুরূফি-দ্দুমূ'ই মিন খশইয়াতিকা ক্বাবলাআন তাকূনাদ্দুমূ'উ দামা ওয়াল আজরাসু জামরান- কিতাবুদ্‌দোয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৮০, আল্লামা তিবরানী প্রণীত, বৈরুতে ছাপা, ৩৬০ হিজরী)]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে কান্নরত চোখ দান করো যা তোমার ভয়ে পানি বইয়ে অন্তরকে শীতল করে দেয়, এর পূর্বে যে, এর দ্বারা চোখের পানি রক্তে পরিণত হয়ে যায় আর পাথর অঙ্গারে পরিণত হয়।

নামাযের পরে দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন। আমি এক রাতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে নামায থেকে অবসর হয়ে এ দোয়া পড়তে শুনেছি ঃ

বুখারীর বর্ণনানুযায়ী-আল্লাহুম্মাজ'আললী নূরান থেকে আরম্ভ হওয়া এ দোয়ার শেষে বক্র চিহ্নিত অংশ, যাতে নূর চেয়ে দোয়া রয়েছে, ফজরের নামাযের পূর্বেও রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِىْ بِهَا قَلْبِىْ وَتَجْمَعُ بِهَا اَمْرِىْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِىْ، وَتَرُدُّ بِهَا غَائِبِىْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِىْ، وَتُزَكِّىْ بِهَا عَمَلِىْ وَتُلْهِمُنِىْ بِهَا رُشْدِىْ، وَتَرُدُّ بِهَا اُلْفَتِىْ، وَتَعْصِمُنِىْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ اِيْمَانًا وَّيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهٗ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْفَوْزَ فِى الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَآءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَآءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَآءِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِىْ، وَاِنْ قَصُرَ رَاْيِىْ وَضَعُفَ عَمَلِىْ، وَافْتَقَرْتُ اِلٰى رَحْمَتِكَ فَاَسْاَلُكَ يَا قَاضِىَ الْاُمُوْرِ، وَيَا شَافِىَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ اَنْ تُجِيْرَنِىْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ، اَللّٰهُمَّ وَمَا قَصُرَ عَنْهُ رَاْيِىْ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْاَلَتِىْ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِىْ مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَّهٗ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، اَوْ خَيْرٍ اَنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ، فَاِنِّىْ اَرْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ، وَاَسْاَلُكَهٗ بِرَحْمَتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ يَا ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْاَمْرِ الرَّشِيْدِ، اَسْاَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ، مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ، الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، اِنَّكَ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ، وَاَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ، غَيْرَ ضَآلِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ، سِلْمًا لِّاَوْلِيَآئِكَ، عَدُوًّا لِّاَعْدَآئِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَحَبَّكَ، وَنُعَادِىْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَآءُ وَاِلَيْكَ الْاِجَابَةُ، اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ،

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا فِىْ قَلْبِىْ وَنُوْرًا فِىْ قَبْرِىْ، وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ، وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِىْ، وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِىْ، وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِىْ وَنُوْرًا فِىْ سَمْعِىْ، وَنُوْرًا فِىْ بَصَرِىْ، وَنُوْرًا فِىْ شَعْرِىْ، وَنُوْرًا فِىْ بَشَرِىْ، وَنُوْرًا فِىْ لَحْمِىْ وَنُوْرًا فِىْ دَمِىْ، وَنُوْرًا فِىْ مُخِّىْ، وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ، اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا، وَاَعْطِنِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا،

سُبْحَانَ الَّذِىْ تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهٖ، سُبْحَانَ الَّذِىْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهٖ، سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يَنْبَغِى التَّسْبِيْحُ اِلَّا لَهٗ سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔

(ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা রহমাতাম্মিন ইনদিকা তাহদী বিহা ক্বলবী ওয়া তাজমা'উ বিহা আমরী-ওয়া তালুম্মুবিহা শা'আসী তারুদ্দু বিহা গায়িবী ওয়া তুরফা'উ বিহা শাহিদী ওয়া তুযাক্কী বিহা 'আমালী ওয়া তুলহিমুনী বিহা রুশদী ওয়া তারুদ্দু বিহা উলফাতী ওয়া তা'সিমুনী বিহা মিন কুল্লি সূই

আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী ঈমানাঁ ওয়া ইয়াক্বীনান লায়সা বা'দাহূ কুফরুন- ওয়া রহমাতুন আনালু বিহা শারফা কারমাতিকা ফিদ্দুন্‌য়া ওয়াল আখিরাতি- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকাল ফাওযা ফিল ক্বযাই ওয়া নুযুলাশ্ শুহাদাই ওয়া 'আয়শাস্ সু'আদাআই ওয়ান্‌নাসরা 'আলাল আ'দাআই-আল্লাহুম্মা ইন্নী উনযিলু বিকা হাজাতী-ওয়া ইন ক্বসূরা রা'ঈ ওয়া যা'উফা 'আমালী ওয়াফতাক্বরতু ইলা রহমাতিকা ফা আসয়ালুকা ইয়া ক্বাযিয়াল উমূরি- ওয়া ইয়া শাফিয়াস্‌সুদূরি কামা তুজীরু বায়নাল বুহূরি আন তুজীরানী মিন-'আযাবিস্ সা'ঈর ওয়া মিন দা'ওয়াতিস্ সুবূরি-ওয়া মিন ফিতনাতিল কুবূরি- আল্লাহুম্মা ওয়ামা ক্বসূরা 'আনহু রা'ঈ-ওয়ালাম তাবলুগহু মাসআলাতী-ওয়ালাম তাবলুগহু নিয়্যাতী মিন খয়রিন ওয়াআত্তাহূ আহাদা ম্মিন খলক্বিকা-আও খয়রিন আতা মু'ত্বীহি আহাদাম্মিন 'ইবাদিকা-ফী ইন্নী আরগবু ইলায়কা ফীহি-ওয়া আসআলুকাহু বিরহমাতিকা ইয়্যা রব্বাল 'আলামীন - আল্লাহুম্মা ইয়া যালহাবলিশ্ শাদীদি-ওয়াল আমরির রশীদি আসআলুকাল আমনা ইয়াওমাল ওয়া'ঈদি ওয়াল জান্নাতা ইয়াত্তমাল খুলূদি-মা'আল মুক্বররবীনাশ্ শুহূদির রুক্কা'ইস্ সুজূদিল্ মূফীনা বিল 'উহূদি- ইন্নাকা রহীমুন ওয়াদূদুন-ওয়া ইন্নাকা তাফ্-আলু মাতুরীদু-আল্লাহুম্মাজ 'আলনা হাদীনা মুহতাদীনা-গয়রা যাল্লীনা ওয়ালা মুযিল্লীনা সিলমাল্ লিআওলিয়াইকা 'আদুবাল্লি আ'দাইকা-নুহিব্বু বিহুব্বিকা মান আহাব্বাকা -ওয়া নু'আদি' বি'আদাওয়াতিকা মিন খালাফাকা -আল্লাহুম্মা হাযাদ্ দু'আউ ওয়া ইলায়কাল ইজাবাতু-আল্লাহুম্মা হাযাল্ জুহ্দু ওয়া আলায়কাত্তাকিলানু

আল্লাহুম্মাজ 'আল্‌লী নূরান ফী ক্বলবী ও নুরান ফী ক্ববরী-ওয়া নূরান ম্মিম বায়নি ইয়াদাইয়্যা-ওয়া নূরান 'আন শিমালী-ওয়া নূরাম্মিন ফাওক্বী ওয়া নূরাম্মিন তাহ্তী ওয়া নূরান ফী সাম্‌ঈ ওয়ানূরান ফী বাসারী ওয়া নূরান ফী শা'রী, ওয়া নূরান ফী বাশারী ওয়া নূরান ফী লাহ্মী, ওয়া নূরান ফী দামী ওয়া নূরান ফী মুখ্খী ওয়া নূরান ফী 'ইযামী- আল্লাহুম্মা আ'যিম লী নূরান ওয়া আ'ত্বিনী নূরান ওয়াজ'আল লী নূরান-

সুব্‌হানাল্লাযী তাআত্বফা বিল 'ইয্‌যি ওয়া ক্বলা বিহী-সুব্‌হানাল্লাযী লাবিসাল মাজ্‌দা ওয়া তাকার্‌রমা বিহী সুব্‌হানাল্লামী লা ইয়াম্বাগীত্‌তাসবীহু ইল্লা লাহূ সুবহানা যীল ফায্‌লি ওয়ান্নি'আমি- সুবহানা যীল মাজ্‌দি ওয়াল কারামি সুবহানা যীল জালালি ওয়াল ইকরামি - তিরমিযী, কিতাবুদ্‌দাওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার ঐ বিশেষ করুণার প্রার্থী যার মাধ্যমে তুমি আমার অন্তরকে সঠিক পথ দেখাও। আর আমার কাজ করে দাও এবং আমার ছড়ানো-ছিটানো কাজকে তুমি গোছ-গাছ করে দাও, আর আমার হারানো লোককে তুমি পাইয়ে দাও, এবং আমার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন লোককে সম্মান দাও। তুমি তোমার করুণায় আমার আমলকে পবিত্র করে দাও আর আমাকে সঠিক পথ ও হেদায়াত ইলহাম করো আর যে জিনিসের প্রতি আমার আকর্ষণ আছে তা যেন আমি পেয়ে যাই। এমন বিশেষ করুণায় আমাকে যেন প্রত্যেকটি মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করে। হে আল্লাহ্! আমাকে এমন স্থায়ী ঈমান ও দৃঢ়-বিশ্বাসও দান করো যার পরে কুফরী হয় না। এমন করুণা দান করো যার মাধ্যমে আমাকে পৃথিবী ও আখেরাতে তোমার কারামতের সৌভাগ্য লাভ হয়ে যায়। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছ থেকে সব মীমাংসার সফলতা চাচ্ছি আর শহীদদের আতিথেয়তা, সৌভাগ্যবানদের জীবন ও শত্রুদের ওপর বিজয় ও সাহায্যের প্রত্যাশী। হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তো আমার প্রয়োজনের সময়ে তোমার দোর গোড়ায় উপস্থিত হয়ে গেছি। যদি আমার বুদ্ধিতে কমতি থাকে এবং আমার চেষ্টায় দুর্বলতাও থাকে তখনও আমি তোমার করুণার ভিখারী। অতএব হে সব কিছুর মীমাংসাকারী, হে অন্তরে স্বস্তি প্রদানকারী! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যেভাবে উত্তাল সমদ্রে তুমি মানুষকে বাঁচিয়ে নাও সেভাবেই আমাকেও আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে নাও। ধ্বংসের গর্জন ও কবরের বিপর্যয় থেকে আমাকে আশ্রয় দাও।

হে আল্লাহ্! যে দোয়া থেকে আমার বুদ্ধি অক্ষম আর যে বিষয়ের জন্যে আমি হাত প্রসারিত করে চাই নি অবশ্যই সেই কল্যাণ ও সেই মঙ্গল যার আমি নিয়্যতও করতে পারি না কিন্তু তুমিই নিজের সৃষ্টির মধ্য থেকে কারও সাথে ঐসব কল্যাণের অঙ্গীকার করে রেখেছো বা নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে তুমি ঐ কল্যাণ দিতে যাচ্ছো তাই এমন প্রত্যেক কল্যাণের জন্যে আমি অবশ্যই প্রত্যাশী। আর হে বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক! তোমার করুণার দোহাই দিয়ে তোমার নিকট ঐ কল্যাণ চাচ্ছি। হে আল্লাহ্! সুদৃঢ় সম্পর্ককারী ও সঠিক পথ ও হেদায়াতের মালিক। আমি কিয়ামতের দিন তোমার নিকট থেকে নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা করি আর ঐ চিরস্থায়ী পর্যায়ে জান্নাত চাচ্ছি। তোমার দরবারে হাজিরা দেয় এমন নৈকট্য-প্রাপ্ত বান্দাদের সাথে এবং রুকূ ও সিজদাহ্কারী ও অঙ্গীকার পূর্ণকারীদের সান্নিধ্যে, নিশ্চয় তুমি বার বার কৃপাকারী ও পরম মমতাময়। নিঃসন্দেহে তুমি যা চাও করে থাকো। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এমন হেদায়াতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক বানিয়ে দাও যারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় না আর অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে না। আমরা তোমার প্রিয়দের ও বন্ধুদের জন্যে নিরাপত্তার বাণী বাহক হই। এবং তোমার শত্রুদের জন্যে যুদ্ধের নিদর্শন হই। আমরা তোমার ভালবাসার প্রসাদে তোমার প্রেমিকদের সাথে ভালবাসার সম্পর্কস্থাপনকারী ও তোমার বিরোধীদের ও তোমার সাথে শত্রুতাকারীদের সাথে তোমার খাতিরে শত্রুতা পোষণকারী হই। হে আল্লাহ্! আমাদের অতি বিনীত দোয়া উপস্থাপন করলাম যা গ্রহণ করা তোমার আয়ত্তাধীন। হে আল্লাহ্! এ দোয়াই আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার শেষ পর্যায়। এখন আমাদের ভরসা তোমার সত্তার ওপরেই।

হে আল্লাহ্! আমার জন্যে আমার হৃদয়ে জ্যোতিঃ সৃষ্টি করে দাও। আমার কবরও আলোকিত করে দাও। আমার সামনে ও পিছনে আলোকিত করে দাও। ডানে ও বামে আলোকিত করে দাও। ওপরে ও নীচে জ্যোতিঃ হোক। আমার শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়কে আলোকিত করে দাও। আমার চুল ও ত্বককেও জ্যোতির্ময় করে দাও। আমার মাংস ও রক্তেও জ্যোতিঃ পূর্ণ করে দাও। আমার মস্তিষ্ককে আলোকিত করে দাও। আমার হাড়গোড়ে জ্যোতিঃ ভরে দাও। হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে জ্যোতির মাহাত্ম্য সৃষ্টি করে দাও এবং পরে আমাকে ঐ জ্যোতিঃ দান করো। মোটকথা আমাকে আপাদমস্তকই জ্যোতিঃ বানিয়ে দাও। ঐ সত্তাই পবিত্র যিনি সম্মান ও সৌন্দর্যের পোষাকে আচ্ছাদিত এবং তিনি সম্মানকে তাঁর জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। পবিত্র হলেন ঐ সত্তা যা বুযূর্গীর পোষাকে আচ্ছাদিত হয়ে সম্মানের সাথে স্থায়ী রয়েছেন। পবিত্র হলেন সেই সত্তা যাঁর ছাড়া অন্য কারও পবিত্রতা বর্ণনা করা সমীচীন নয়। পবিত্র ঐ আশিস ও কল্যাণের সত্তা। পবিত্র হলেন ঐ সম্মান ও বুযূর্গীর অধিকারী। আর পবিত্র হলেন ঐ প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

রসূলে করীম (সঃ)-এর সাহাবাগণের জীবন-চরিত

রসূল (সঃ)-এর খাদেম হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)

মুল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ

(১৫তম কিস্তি)

নাম ও বংশ পরিচয় ঃ

হযরত উসামা (রাঃ) রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুক্তি-প্রদত্ত দাস যায়েদ বিন হারিসাহ্ (রাঃ)-এর পুত্র। যায়েদ ইয়ামেনের সম্ভ্রান্ত গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তাঁকে গোলাম বানিয়ে আরবের বিখ্যাত মেলায় (উকায) বিক্রী করা হয়েছিলো। হযরত হাকিম বিন হাযাম নিজের ফুফী হযরত খদীজাহ (রাঃ)-এর জন্যে ক্রয় করেন ও উম্মুল মু'মিনীনের বিয়ের পরে যায়েদকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাতে ন্যস্ত করেন।

ইসলাম গ্রহণ ও রসূল-প্রেম ঃ

গোলামদের মধ্যে যায়েদ বিন হারিসাহ্ (রাঃ) সর্ব -প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে মক্কায় পৌছেন আর আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করলেন যেন যায়েদকে বাড়ী যাওয়ার জন্যে অনুমিত দেয়া হয়। তাই তিনি যায়েদকে ডেকে অধিকার দিলেন যে, চাইলে মা - বাবার সাথে বাড়ী চলে যাও নতুবা আমার নিকট থেকে যাও। যায়েদ (রাঃ)-এর প্রাণ রসূলে আরাবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাসত্ব বরণ করেছিলো। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন ঃ

"খোদার কসম! আমি আপনার ওপরে কাউকে প্রাধান্য দিবো না"।

সুতরাং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁকে মুক্ত করে দিলেন বরং তাঁকে পালিত পুত্র বলে ঘোষণা দিলেন। তাঁকে যায়েদ বিন হারিসার বদলে জায়েদ বিন মুহাম্মদ ডাক আরম্ভ হলো। (**উদউহুম লি আবায়হিম** - আয়াত নাযেল হওয়ার পরে তাঁকে আবার যায়েদ বিন হারিসাহ্ বলা আরম্ভ হলো) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যায়েদ (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ

"হে যায়েদ! তুমি আমার ভাই ও মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি"। উসামা (রাঃ)-এর মা রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সম্মানিতা মা হযরত আমিনাহ্র সেবিকা ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো বরকাহ্। উম্মে আয়মন উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। কিছু দিন আয়া ও রসূলে করীম (সঃ)-এর এ ধাত্রী হিসেবে তাঁকে দেখা শুনা ও প্রতিপালনের সৌভাগ্য লাভ হয়েছিলো তাঁর। যখন হযরত আমিনাহ্ ইয়াসরীবে আঁ হযরত (সঃ)-এর নানী বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন উম্মে আয়মন (রাঃ) সাথে ছিলেন। এ সফর থেকে ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে হযরত আমিনাহ্ মৃত্যুবরণ করেন। তখন উম্মি আয়মন (রাঃ)-ই ঐ এতীম কিন্তু মহান শিশুকে মক্কায় নিয়ে এসে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে সোপর্দ করেন।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উম্মি আয়মনকে 'মা' ডাকতেন। একবার হুযূর (সঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি জান্নাতী মহিলাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে উম্মী আয়মনকে করুক। হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ) ইহা শুনে তাঁকে বিয়ে করে নেন। পরে তাঁর গর্ভেই উসামা (রাঃ) জন্ম নেন ... এ সারাটা পরিবার রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পুণ্য দৃষ্টির সামনে ছিলো।

উসামা (রাঃ) ও যায়েদ (রাঃ)-এর সৌভাগ্য লক্ষণীয় ছিলো। উভয়েরই রসূল (সঃ)-এর ভালবাসার উপাধি রসূল (সঃ)-এর দরবার থেকে লাভ হয়। হযরত উসামা (রাঃ)-এর ডাক নাম আবূ মুহাম্মদ ও আবূ যায়েদ হিসেবে বিখ্যাত ছিলো।

দাসপুত্রের সাথে ভালবাসা ঃ

উসামা (রাঃ)-এর সাথে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিশেষ ভালবাসা ছিলো। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, উসামা আমার নিকট অন্যান্য লোকের চেয়ে অধিক প্রিয় কেবল (আমার কন্যা) ফাতিমা ব্যতীত।" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ

"উসামা (রাঃ) আমাদের দরজার চৌকাঠের সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে ব্যথা পায় ও রক্ত পড়তে থাকে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাকে রক্ত পরিষ্কার করতে বললে আমি অপসন্দ করলাম এবং ঘৃণা প্রকাশ করলাম। তখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁকে চুমু খেলেন এবং স্বয়ং নিজের হাতে রক্ত পরিষ্কার করে দিয়ে বল্লেন, যদি উসামা (রাঃ) মেয়ে হতো তাহলে আমি তাকে উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদ পরাতাম এবং অলংকার দিয়ে সাজিয়ে দিতাম। সম্ভবতঃ ইহা ঐ সময়ের পরের ঘটনা যখন হযরত আয়েশা বলেন, "একবার হুযূর সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম উসামা (রাঃ)-এর নাক পরিষ্কার করতে চাইলেন। আমি বললাম, হুযূর! রাখুন আমি দিচ্ছি"। হুযূর (সঃ) বললেন, "আয়েশা উসামাকে আদর করো আমিও তাকে ভালবাসি।"

স্বয়ং উসামা (রাঃ) বলেন, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁকে ও হযরত হুসায়েন (রাঃ)-কে দু'টি উরুতে বসিয়ে নিতেন আর বলতেন,

"হে আল্লাহ্! এদের উভয়কে ভালবাস। আমিও তাদেরকে ভালবাসি"। কিন্তু এ ভালবাসা কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ছিলো। কখনও ঐশী-নির্দেশের বিরোধী হয় নি। সুতরাং একবার মখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করে। এর শরীয়তসম্মত বিধান ছিল হাত কাটা। ইহা ঐ গোত্রের জন্যে অসম্মানের কারণ ছিলো। লোকেরা মনে করলো, হুযূর (সঃ)-এর নিকট কে সুপারিশ করবে?

শেষে এ সিদ্ধান্তে পৌছলো যে, উসামা ব্যতিরেকে আর কেউ এ সাহস দেখাতে পারে না? কেননা, সে রসূলে খোদা (সঃ)-এর সবচে' প্রিয়! সুতরাং উসামা (রাঃ)-কে পাঠানো হলো। তখন হুযূর (সঃ) খুবই উচ্চ মার্গের ন্যায়-বিচারকে সমুন্নত রাখতে গিয়ে উসামাকে ধমক দিলেন আর বলেন,

"উসামা, তুমি কি আল্লাহ্র সীমা ভঙ্গের সুপারিশ করছো। যদি এ মহিলার স্থলে আমার মেয়ে ফাতিমাও হতো তাহলে আমি তার হাতও কেটে দিতাম।"

ধর্মীয় সেবা ঃ

হযরত যায়েদ (রাঃ) মূতার যুদ্ধে রোম সীমান্তে শহীদ হয়েছিলেন। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে রোমানদের মোকাবেলা করার জন্যে যে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন এর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন হযরত উসামা (রাঃ)-কে। সেনাবাহিনীতে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-দের মত বড় ভক্ত সাহাবাও শামেল ছিলেন। উসামা (রাঃ)-এর বয়স ছিলো এ সময় ১৮ বছর। এ সেনাবাহিনী মদীনার নিকটবর্তী 'জরফ' নামক একটি স্থানে ছাউনী গেড়ে ছিলো। হুযূর (সঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আর এ রোগ তাঁর মরণ-রোগ সাব্যস্ত হয়েছিলো। সুতরাং হুযূর (সঃ)-এর অসুস্থতাকে দৃষ্টিপটে রেখে এ সেনাবাহিনীকে থামিয়ে দেয়া হয়েছিলো। উসামা (রাঃ) 'জরফ' থেকে সাক্ষাতের জন্যে আসলেন। হুযূর (সঃ) চুপ করে ছিলেন। কথা বলেন নি। উসামা (রাঃ)

বলেন ঃ

"যখন আমি উপস্থিত হলাম তখন হুযূর (সঃ) উভয় হাত আমার ওপরে রাখলেন এবং পরে দু'টো হাতই উঠিয়ে নিলেন। আমি জানতাম যে, হুযূর (সঃ)আমার জন্যে দোয়া করছিলেন।"

সুবহানাল্লাহ্! গোলামের জন্যে প্রভুর ভালবাসার এক আশ্চর্য অবস্থা বিরাজ করছিলো। মৃত্যুপথের যাত্রী হয়েও এ এতীম যুবকের জন্যে দোয়ায় লিপ্ত ছিলেন। আসলে এটা ছিলো তাঁর স্বভাবসুলভ ভালবাসার প্রকাশ!

হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর শাহাদতের পরে উসামা (রাঃ)-এর বোনকে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কাঁদতে দেখলেন। তখন তিনি (সঃ)ও কান্না শুরু করলেন। সা'দ বিন উবায়দা (রাঃ) নিবেদন করলেন, হুযূর (সঃ)-এটা কী? তিনি (সঃ) বল্লেন, এটা ভালবাসার আবেগানুভূতি।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে হযরত উসামা (রাঃ) খুব অল্প বয়সী ছিলেন। তদ্সত্ত্বেও তাঁরও কোন কোন যুদ্ধে যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিলো। সুতরাং তাঁর একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। এক যুদ্ধের সময় এক কাফির সামনে পড়লো। যখন উসামা আঘাত করতে যাবেন তখন সে কলেমা শাহাদত পড়ে ফেল্লো যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই। হযরত উসামা তাকে হত্যা করে ফেলেন এজন্যে যে, সে মরণের ভয়ে কলেমা পাঠ করেছে। হযরত উসামা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট এ ঘটনা উল্লেখ করলে তিনি বল্লেন, ঐ লোকটি কলেমা শাহাদত পাঠ করার পরেও তুমি তাকে হত্যা করলে? আমি নিবেদন করলাম, হুযূর (সঃ) সে তো কেবল বাঁচার জন্যে কলেমা পড়েছিলো। তিনি (সঃ) বল্লেন, তুমি কি তার হৃদয় চিড়ে দেখেছিলে? এরপরে আবার বল্লেন, তুমি কি কলেমা শাহাদত পাঠ করার পরেও তাকে হত্যা করলে?

উসামা (রাঃ) বলেন, হুযূর (সঃ)-এর এ বাক্যটি রাগের সাথে এত বার উচ্চারণ করলেন যে, আমি চাচ্ছিলাম যে, হায়! আজকের আগে যদি মুসলমান না হতাম আজকের পরে মুসলমান হতাম তাহলে আমার দ্বারা এ ত্রুটি হতো না এবং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টি থেকে আমি বেঁচে যেতাম।

উসামা (রাঃ) বলেন, এর পরে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, ভবিষ্যতে কখনও কোন ব্যক্তিকে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে, হত্যা করবো না। এ কারণেই তিনি হযরত আলী করমাল্লাহু-এর যুগে তাঁর সাথে যুদ্ধে যোগ দেন নি আর এ অজুহাতই পেশ করেন পাছে কোন কলেমা পাঠকারীকে হত্যা করে বসি।

তিনি ফেতনা-ফাসাদের যুগ দেখেছিলেন কিন্তু ফেতনা থেকে বেঁচে থাকেন আর এ যুগে দূরে দূরে থাকেন। আলী বিন খশরম বলেন, আমি ইমাম বাকীকে জিজ্ঞেস করলাম, ফিতনা থেকে কে রক্ষা পেয়েছিলো? তখন তিনি বলতে থাকলেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে যে পরিচিতি লোক ফেতনা থেকে রক্ষা পান তাঁরা হলেন চারজন। সা'দ বিন মালিক (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ), মুহাম্মদ বিন মুসাল্লামাহ্ (রাঃ) এবং উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন হযরত উসামা (রাঃ)-কে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন তখন কিছু লোক এত অল্প বয়সী ও দাসের পুত্র হওয়ার কারণে তাঁর নেতৃত্বের ওপরে আপত্তি তোলে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

"তোমরা উসামা (রাঃ)-এর ওপরে দোষারোপ করে থাকো আর তার নেতৃত্বের ওপরে অভিযোগ তোল আর এর আগেও তোমরা তার বাবার ব্যাপারেও এমনই করেছিলে যদিও সে আমীর হওয়ার যোগ্য ছিলো আর সব লোকের তুলনায় সে আমার খুব প্রিয়ও ছিলো, আর এখন তার এ পুত্র তার পরের সকল লোকের তুলনায় আমার আদরের। অতএব তাঁর ব্যাপারে আমার আদেশ মেনে নাও। সে তোমাদের ভাল লোকদের অন্তর্ভুক্ত।"

তদুপরি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মৃত্যুশয্যায় সেনা বাহিনীকে রওয়ানা করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। সুতরাং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালামের ওফাত হলে তখন হযরত আবূবকর খলীফা আওওয়াল (রাঃ) সেনাবাহিনী রওয়ানা করার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। হযরত উমর (রাঃ) মতামত দিলেন। এ নাজুক অবস্থায় যখন কিনা নও মুসলিমরা মুরতাদ হয়ে গেছে আর অধিকাংশই যাকাত দিতে অস্বীকারকারী, অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো নিরসন করে এ সেনাবাহিনীকে রওয়ানা করা হোক। হযরত আবূ বকর খুবই প্রতাপপূর্ণ ভাষণ দিলেন ঃ

"খোদার কসম! যদি মদীনার অলিগলিতে কুকুর মেয়েদেরকে হেঁচড়িয়ে নেয় তাহলেও উসামার বাহিনীকে বাধা দেব না। কোহাফার সন্তান খলীফা হয়েই কি সর্বপ্রথম এ কাজ করবে যে, রসূলুল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত সেনাবাহিনীকে রুখে দেয়"।

সুতরাং এ নাজুক অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রাঃ) উসামার বাহিনীকে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। তিনি (রাঃ) শহরের বাইরে গিয়ে তাদের বিদায় দিয়ে আসেন। উসামা ঘোড়ার ওপরে বসে ছিলেন। আর খলীফাতুর রসূল হযরত আবূ বকর (রাঃ) পায়ে হেঁটে সাথে সাথে চলছিলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) উসামা (রাঃ)-কে বল্লেন,

"যদি সমীচীন মনে করো তাহলে উমর (রাঃ) -কে আমার সাহায্যের জন্যে পিছনে ছেড়ে যেও।"

সুতরাং হযরত উসামা (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)-কে আনন্দের সাথে অনুমতি দিলেন। এ ঘটনার পরে কিছু লোক হযরত উসামা (রাঃ)-এর নেতৃত্বের ওপরে আপত্তি তোলে এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট নিবেদন করে যে, সেনাবাহিনীর নেতা কোন অভিজ্ঞ লোককে বানানো হোক যখন কিনা সেনাবাহিনীর মাঝে অনেক অভিজ্ঞ উপস্থিত আছেন। তিনি (রাঃ) বলেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যাকে নেতা নিযুক্ত করেছেন তিনিই এ সেনাবাহিনীর নেতা হবেন।

জ্ঞান বিষয়ক সেবা ঃ

হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালে সময় হযরত উসামার বয়স ১৮-২০ বছর ছিলো। তিনি সরাসরি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকেই বর্ণনা করেন এবং তাঁর পিতা যায়েদ বিন হারিসাহ্ (রাঃ) ও মা উম্মি আয়মন (রাঃ) থেকেও তিনি এবং তাঁর দু'টি ছেলে হাসান ও মুহাম্মদ ছাড়াও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ), উরওয়া বিন যাবির (রাঃ), হাসান বসরী (রাঃ), উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ), আবূ উসমান আল্ হিন্দী প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা দেন যে, তাঁর বুক নবীর কথার ভান্ডার ছিলো। বড় বড় সাহাবার যে কথার ওপরে সন্দেহ লাগতো তাঁরা তাঁর কাছে আসতেন। শেষ বয়সে তিনি দামেস্কের একটি শহর মযাহ্-তে কিছু দিনের জন্যে বসবাস করেন। পরে মক্কা নগরে কিছু দিন থাকেন। পরিশেষে মদীনায় আসেন ও হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদতের পরে 'জরফ' নামক স্থানে ৫৪ হিজরীতে প্রায় ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কারও কারও মতে তাঁর মৃত্যুর সন ৫৮ হিজরী যখন কিনা মুআবিয়া (রাঃ)-এর রাজত্ব চলছিলো। তাঁর মরদেহ মদীনায় নিয়ে আসা হলো এবং এখানেই সমাহিত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১। সহীহ্ বখারী,
২। জামে' তিরমিযী
৩। আসাবাহ্ ফী তামিযিস্ সাহাবা
৪। আসাদুল গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবা
৫। আল্ আকমাল ফী আসমাইর রিজাল (চলবে)

অনুবাদ- **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

ফুলের তোড়া

(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

মূল ঃ আমাতুল বারী নাসের ও বুশরা দাউদ

(নবম কিস্তি)

সূরাতুল বাকারাহ্-২

(৯২) ওয়া ইযা ক্বীলা লাহুম আমিনূ
আর (স্মরণ করো) যখন বলা হয় তাদেরকে তোমরা ঈমান আনো

বিমা আনযালাল্লাহু ক্বালূ নূ'মিনু
তার ওপরে যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন তারা বলে আমরা ঈমান আনি

বিমা উনযিলা 'আলায়না ওয়া ইয়াকফুরূনা
তার উপরে যা নাযেল করা হয়েছে আমাদের ওপরে এবং তারা অস্বীকার করে

বিমা ওয়ারায়াহূ ওয়া হুয়া আল্ হাক্কু মুসাদ্দিকান
তার যা তাছাড়া যদিও তা সত্য সত্যায়নকারী

লিমা মাআহুম কুল ফালিমা তাক্বতুলূনা
তার যা তাদের সাথে তুমি বলো অতএব কেন তোমরা হত্যা করতে ছিলে

আম্বিয়াআল্লাহ্ মিন ক্বলু ইন কুনতুম মু'মিনীন
আল্লাহ্র নবীগণকে এর পূর্বে যদি তোমরা হও মু'মিন

(৯৩) ওয়া লাক্বদ জাআকুম মূসা বিল বায়্যিনাত
এবং অবশ্যই সে তোমাদের নিকট আসলো মূসা (আঃ) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ

সুম্মাত্তাখাযতুম আল্ 'ইজলা মিম বা'দিহী ওয়া আনতুম
অতঃপর তোমরা বানালে বাছুরকে এর পরে আর তোমরা

যলিমূন (৯৪) ওয়া ইয্ আখাযনা মীসাক্কুকুম
জালেম ছিলে এবং যখন আমরা নিয়েছিলাম তোমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার

ওয়া রাফা'না ফাওক্কুকুমুত্তূর
আর আমরা উন্নীত করেছিলাম তোমাদের ওপরে তূর (পর্বতকে)

খুযূ মা আতায়নাকুম
(আর বল্লাম) তোমরা ধরো, যা আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি

বিকুওওয়াতিন ওয়াসমা'উ ক্বালা সামি'না
মজবুতভাবে আর তোমরা শুনো তারা বললো আমরা শুনলাম

ওয়া আসায়না ওয়া উশরিবূ ফী কুলূবিহিম
ও আমরা অমান্য করলাম এবং তাদের পান করানো হলো তাদের প্রাণে

আল্ 'ইজলা বিকুফরিহিম কুল বি'সামা
বাছুর তাদের অস্বীকারের কারণে, তুমি বলো কতই না মন্দ তা যে

ইয়া'মুরুকুম বিহী ঈমানুকুম ইন্কুনতুম
সে তোমাদেরকে আদেশ দেয় যার তোমাদের ঈমান যদি তোমরা

মু'মিনীন (৯৫) কুল ইন কানাত লাকুম আদ্দার
মু'মিন হও তুমি বল যদি তোমাদের জন্যেই হয়ে থাকে ঘর

আল্ আখিরাত 'ইনদাল্লাহি খালিসাতান
পরকাল আল্লাহ্র নিকট বিশেষ করে (তোমাদের জন্যে)

মিন দূনিন্নাসি ফাতামান্নাউল মাওতা ইনকুনতুম সদেক্বীন
অন্য লোকদের ছাড়া তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও

(৯৬) ওয়ালাঁইয়াতামান্নাওহু আবাদান বিমাক্বদ্দামাত
আর তারা অবশ্যই তা কামনা করবে না কখনও যা আগে পাঠিয়েছে
তার কারণে

আইদীহিম ওয়াল্লাহু 'আলীমুন বিয্যলিমীন
তাদের হাত আর আল্লাহ্ বেশি বেশি জানেন জালেমদেরকে।

(৯৭) ওয়ালা তাজিদান্নাহুম আহরাসান্নাসি
এবং অবশ্যই তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে সব লোকদের চেয়ে অত্যাধিক লোভী

'আলা হায়াতিন ওয়া মিনাল্লাযীনা আশরাকূ
ইহ জীবনের ব্যাপারে এবং এসব লোকদের চেয়েও যারা অংশী খাড়া করে

ইয়াওয়াদ্দু আহাদুহুম লাও ইউআম্মারু
তারা চায় তাদের কাউকে হায়! যদি তাকে বয়স দেয়া হয়

আলফা সানাতিন ওয়ামা হুয়া বিমুযাহ্যিহিহী
হাজার বছর অথচ তা নয় তাকে রক্ষা করতে পারবে

মিনাল আযাবি আঁ'ইউআম্মারা ওয়াল্লাহু
শাস্তি থেকে (এভাবে) যেন তাকে বয়স দিয়ে দেয়া হয় এবং আল্লাহ্

বাসীরুন বিমা তা'মালূন (৯৮) কুল মান কানা
সব দেখেন যা তারা করছে তুমি বলো যে হয়েছে

'আদুওয়ালি জিবরীলা ফাইন্নাহু নায্যালাহু
জিব্রাঈলের শত্রু অতএব নিশ্চয় তিনি অবতীর্ণ করেছেন
তাকে (অর্থাৎ কুরআন)

'আলা ক্বলবিকা বিইয্নিল্লাহ্ মুসাদ্দিকান
তোমার হৃদয়ে আল্লাহ্র আদেশে সত্যায়নকারী করে

লিমা বায়না ইয়াদায়হি ওয়া হুদান ওয়া বুশরা
ঐ (কিতাবের) যা রয়েছে তার সামনে এবং হেদায়াতস্বরূপ ও শুভ সংবাদ

লিল মু'মিনীন (৯৯) মান কানা 'আদুয়াল্লিল্লাহ্
মু'মিনদের জন্যে যে হয়েছে আল্লাহ্র শত্রু

ওয়া মালায়কাতিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়া জিব্রীলা
এবং তাঁর ফিরিশ্তাদের ও তাঁর রসূলগণের এবং জিব্রাঈলের

ওয়া মীকালা ফাইন্নাল্লাহা 'আদুয়াল্লিল কাফিরীন
এবং মিকাঈলের তখন নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদের শত্রু

(১০০) ওয়া লাক্বদ আনযালনা ইলায়কা
আর নিশ্চয় আমরা অবতীর্ণ করেছি তোমার প্রতি

আয়াতিন বায়্যিনাতিন ওয়া মা ইয়াকফুরু বিহা
আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট এবং অস্বীকার করে না এগুলো

ইল্লাল ফাসিকুন (১০১) আওয়া কুল্লামা 'আহাদূ
দুষ্কৃতকারী-অবাধ্যরা ছাড়া তাহলে কি যখনই তারা অঙ্গীকার করেছে

'আহদান নাবাযাহূ ফারীকুন মিনহুম
কোন অঙ্গীকার তাকে ছুঁড়ে দিয়েছে একদল তাদের

বাল আকসারুহুম লা ইউ'মিনূন
বরং তাদের অধিকাংশ ঈমান আনে না।

(১০২) ওয়া লাম্মা জায়াহুম রসূলুন
এবং যখনই এসেছে তাদের কাছে কোন রসূল

'ইনদিল্লাহি মুসাদ্দিকুন লিমা
আল্লাহ্র কাছে থেকে সত্যায়নকারীরূপে তার যা

মা'আহুম নাবাযা ফারীকুন মিনাল্লাযীনা
তাদের কাছে আছে ছুঁড়ে দিয়েছে একদল তাদের থেকে যাদের

উতুল কিতাব কিতাবাল্লাহ ওয়া রায়া
কিতাব দেয়া হয়েছে আল্লাহ্র কিতাব পেছনে

যুহূরিহিম কাআন্নাহুম লা ইয়া'লামূন
তাদের পিঠের যেন তারা তারা জানে না

(১০৩) ওয়াত্তাবা'উ মাতাতলূ আশ্শায়াত্বীন
এবং তারা অনুসরণ করেছে যা তারা পাঠ করত শয়তানেরা

আলা মুলকি সুলায়মান ওয়া মা কাফারু সুলায়মানা
বিরুদ্ধে সুলায়মান এর রাজত্বে এবং সুলায়মান কুফরী করে নি

ওয়া লাকিন আশ্শায়াত্বীনা কা'ফারু ইউ'আল্লিমূনা
কিন্তু শয়তানরা কুফরী করেছে তারা শিখাতো

আন্নাসা আস্সিহ্রা ওয়া মা উনযিলা
লোকদেরকে জাদু / প্রতারণা এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছিলো

'আলা মালাকায়নি বিবাবিলা হারূতা ও মারূতা
দু'ফিরিশ্তার ওপরে বাবিল হারূত ও মারূত

ওয়ামা ইউ'আল্লিমানি মিন আহাদিন হাত্তা
তারা দু'জনে শিখায় নি কাউকে যে পর্যন্ত না

ইয়াকূলা ইন্নামা নাহ্নু ফিতনাতুন ফালাতাকফুর
তারা দু'জন বলে দিতো নিশ্চয় আমরা পরীক্ষার কারণ সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।

(চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা নিরূপণের উপায়

গণিত সাস্ত্রের একটি সূত্র হলো- "দুইয়ে দুইয়ে চার কিংবা দুই দু'গুণে চার"। ইহা অংক শাস্ত্রের প্রারম্ভিক পর্যায়ের একটি চির সত্য সূত্র। যা পন্ডিত মুর্খ, ধনী দরিদ্র, আলো ও আঁধারে সর্বদেশে সর্বজনার কাছেই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সত্য। প্রমাণিত এই সত্যকে অস্বীকার করে এমনজন পৃথিবীতে একজনও নেই। যদি কেউ বিদ্যমান এই সূত্রকে অস্বীকার করে তবে আমরা তাকে নিশ্চিত পাগল নতুবা নিরেট বুদ্ধিহীন অপরিপক্ক জ্ঞানের মানুষ বলে বিবেচনা করব।

অংক শাস্ত্রীয় এই সূত্রটি অকাট্য যুক্তিতে যেরূপভাবে নির্ভুল সত্য ঠিক তেমনিভাবে নিখাদ সত্য বর্তমান যুগের পবিত্র পুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর দাবী ও তাঁর কর্ম-সম্ভার। তিনি অনুরূপই সত্য যেরূপভাবে সত্য সূর্যের আলোর তপ্ততা এবং হিমালয় পর্বতের দৃঢ়তা। যারা তাদের আত্মার সাজা প্রাপ্তির শংকায় শংকিত এবং খোদার স্নেহের আওতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে আতংকিত তারা ইতোমধ্যেই সেই সহজ সরল দীপ্তমান সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন এবং হৃদয়ের ব্যাকুলতার উপশম করেছেন। যার ফলে তারা খোদার বিদ্যানিকেতনের একজন প্রিয় ছাত্র বলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্যদের যারা এখনও পর্যন্ত স্বর্গীয় ঐ সত্য আহ্বানকে গ্রহণ করে নিতে সমর্থ হন নি তাদের আত্মা নিশ্চিতভাবে পরাজিত এবং তারা সাংঘাতিকভাবেই ভাগ্য বিবর্জিত। অতএব তাদের মৃত্যু হবে জাহিলিয়তের (আল্ হাদীস)। ফলেই তাদের জন্য আমার দুঃখ ও অনুশোচনা হয়। মমতা লাগে। তাই স্বীয় অন্তরকে এই তীব্র যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে নেয়ার জন্যই আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের এই কলম প্রচেষ্টা। যারা অদ্যবধি তাদের উদাসীনতা কিংবা অবহেলা ও অমনযোগ এবং চিন্তা চেতনার অপ্রতুলতা হেতু খোদা প্রেরিত এই মহাজনকে যুগের মাহ্‌দী বলে যাচাই করে নিতে সমর্থ হন নি, আমি আপনাদেরই পক্ষ হয়ে সেই সত্যকে পরখ করে নেয়ার নিমিত্তে পুনরায় আহ্বান জানাচ্ছি এবং সাথে কতিপয় শর্ত দিচ্ছি যাতে করে আপনারা সেই সত্যকে যাচাই করে নিতে সমর্থ হন। তৎপরেও খোদার যেসব বান্দা তাঁর প্রতি সাগ্রহে খেয়ালী না হন তবে তাদের জীবন হেফাযতের ভার স্বয়ং খোদার হস্তেই ন্যস্ত রইল।

এই বিচার্য বিষয়ের **প্রথম শর্তটি** হলো ঃ খোদার মনোনীত প্রতিনিধি বলে দাবীদার ব্যক্তিটির দাবীর পূর্বেকার জীবনাদর্শকে দর্শন করা এবং তা নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা। এ প্রেক্ষিতে হযরত রসূলে করীম (সঃ)ও স্বয়ং অনুরূপ কাজই করে গিয়েছেন। তিনি তাঁর কঠিন শত্রুদলের সামনে এ যুক্তিই উপস্থাপন করে বলেছেন, "হে আমার অতীত জীবনের সাথীগণ! যারা আজ আমার বিরোধিতা করছ। তোমরা কি আমার বিগত দিনের দীর্ঘ জীবনকে দেখ নি? তাতে কি একথা প্রমাণিত হয় না যে, আমি একজন মিথ্যাবাদী দাবীদার হ'তে পারি না? আমি এ জীবনে এসে কোনভাবেই একজন মিথ্যাবাদী বলে বিবেচিত হ'তে পারি না? তা হলে কেন তোমরা আমার অমান্যকারী হচ্ছো?" সুতরাং মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর উপর সন্দেহপরায়ণদের যেকোন জনও অনুরূপ মাপকাঠির দ্বারা তাঁর দাবীর পূর্বেকার জীবন বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁকে পরখ করে নিতে পারেন। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, আধ্যাত্ম সেই জীবনে পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হওয়ার মত বিন্দুবৎ কোন খুঁত আপনি খুঁজে পাবেন না, কারণ এ জীবন স্বয়ং খোদার হস্তে পরিচালিত জীবন, এ জীবন স্বর্গালোকে পরিপূর্ণ জীবন। বিগত দিনে অনেক বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞই অনুরূপ অনুসন্ধান কর্ম করে হয়রান হয়েছে কিন্তু কোন খুঁত বের করতে সফল হতে পারে নি। ইন্‌শাআল্লাহ্ এই চ্যালেঞ্জে আদৌ কোনদিন কেউ সফল হ'তে পারবে না।

এক্ষেত্রে **দ্বিতীয় শর্ত** হলো ঃ খোদার পক্ষের হয়ে দাবীদার ব্যক্তিটির দ্বারা সাধিত কর্মকান্ড কী তা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। হযরত মসীহে মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেছেন, "হে আমার প্রিয়গণ! তোমরা তোমাদের স্বভাব তাড়নায় উত্তেজিত হয়ে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করতে উদগ্রীব হয়ো না। কারণ এ ধরনের প্রবৃত্তির ফলে তোমরা কেবলই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। তোমাদের জীবন কলংকিত হবে। কেননা, আমি কদাচ বিফল হতে আসি নি বরং একথা জেনো যে, আমি খোদার এবং খোদা আমার। তোমরা আমার জীবন ও আমার দ্বারা সম্পাদিত কার্যাদির ধারাকে পর্যবেক্ষণ ও অনুসরণ কর। নিশ্চয় তাতে তোমরা তোমাদের পারলৌকিক জীবনের প্রয়োজনীয় রত্নভান্ডারের সন্ধান পাবে। আমি তোমাদের সকলকে কেবল পুণ্যধনে ধনী করার মানসেই পৃথিবীতে আগমন করেছি। সুতরাং তোমরা তোমাদের আত্মার কল্যাণ চাও, তবে আমার অনুগামী হও। নচেৎ হাশরের কাঠগড়ায় তোমরা দোষী বলে বিবেচিত হবে"। তিনি তাঁর কর্মকালীন জীবনে কম বেশী প্রায় নব্বইখানা কিতাব রচনা করে গিয়েছেন এবং তার প্রত্যেকটির দ্বারাই তিনি ইসলাম ও কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন আর আরবী নবী (সঃ)-ই সকল কালের নবী শ্রেষ্ঠ নবী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তৎকালীন সময়ে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর পাহাড় সদৃশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও বজ্র কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন, ইসলাম ছাড়া দুনিয়ার আর সব ধর্মই অলীক এবং অসার। কেবল ইসলামই জিন্দা ধর্ম, তাই তার অনুকম্পা বিনে কেউ কোনভাবেই আর শান্তির সন্ধান খুঁজে পাবে না। নিছক একা এবং বিরোধিতার অগ্নি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ইত্যাকার কর্ম সম্পাদন করা এবং আত্মমর্যাদা সম্পর্কে এত বড় ঘোষণা দেয়া কি কোন মিথ্যাবাদীর পক্ষে সম্ভব? না কোন প্রবঞ্চক কিংবা হঠকারীর পক্ষে সম্ভব? এর বিচারের ভার রইল আমাদের তাবৎসব বিরুদ্ধবাদী বন্ধুগণের বিবেকের উপর। আশা করি আমার সেই বন্ধু সমাজ তাদের উপর ন্যস্ত এ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন।

এ প্রেক্ষিতে **তৃতীয় শর্ত** হলো ঃ দাবীকারক কর্তৃক সেই দাবীগুলি কি কালক্রমে ফলপ্রসূ হয়েছে না কি তাঁর রেখে যাওয়া ঐ ভবিষ্যদ্বাণীগুলি তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই মিথ্যা ও ভন্ড বলে প্রতীয়মান হয়েছে? এক্ষেত্রে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "খোদা আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জামাত ও তাঁর প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাবেন এবং আমাকে ইসলামের একটি বৃহৎ দল উপহার দিবেন। আমার গৃহের চতুর সীমায় যারা বাস করবে তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন। বাদশাহ্‌গণ আমার বস্ত্র হতে কল্যাণ ও আশীষ লাভ করে ধন্য হবেন। আমার ও আমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জামাতের অকল্যাণ সাধনকারীর যুগল হাতকে তিনি দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে দিবেন। পৃথিবীর পটপরিবর্তনকারী ও ধর্মজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী আধ্যাত্মিক কল্যাণমন্ডিত এক পুত্র সন্তান আমাকে উপহার দিবেন। এতদ্ব্যতীতও আমার সত্যতার সাক্ষী-স্বরূপ চন্দ্রে ও সূর্যে ব্যতিক্রমধর্মী গ্রহণ ঘটাবেন ইত্যাদি"। ইহা পরম সত্য যে, বর্ণিত এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলির প্রত্যেকটিই আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে চলছে এবং কালক্রমে পূর্ণ হ'তে থাকবে যা কেবল আমার মুখের দাবীই নয় বরং তার প্রমাণাদি কাগজে কলমে

বিদ্যমান যা সত্য প্রেমিকগণ যাচাই করে নিতে পারেন। এ প্রসঙ্গে এখানে একথা না বললেই নয় যে, হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় সে দেশেরই বাটালা নিবাসী মৌলানা মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী বলেছিলেন, "হে মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আমি আমার প্রভূত প্রশংসার দ্বারা তোমার নামকে আকাশের উচ্চ মার্গে পৌছিয়েছিলাম, এখন আবার আমিই তোমাকে টেনে নীচে নামাব"। কিন্তু হায়! আত্মঅহংকারী ধর্মান্ধ বাটালবী সাহেব চিন্তাই করতে পারে নি যে, যাঁকে স্বয়ং স্বর্গীয় শক্তি নন্দিত করে তাঁকে কি পার্থিব কোন শক্তি নিন্দিত করতে পারে? তা আলবৎ নয়। ফলেই কালক্রমে খোদার হস্তে লালিত সেই 'গোলামে মুহাম্মদের' নাম ও সুনাম তুফান গতিতে বিস্তৃতি লাভ করতে লাগল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। বর্তমানে তাঁরই জামাতের একনিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টা ও ক্লান্তিহীন সাধনার ফলে খোদার অশেষ ফযলে শুধু লক্ষ লক্ষই নয় বরং নিযুত কোটি সংখ্যক নিষ্ঠাবান ও নির্মল চিত্তধারী লোকজন যাদের মধ্যে বড় বড় রাজা বাদশাহ্ও রয়েছেন যারা দৌড়ে এসে আহমদীয়তের ধর্ম সেবার মিছিলে অংশ গ্রহণ করতঃ প্রকৃত ইসলামকে চিনে ও তার সেবা করে ধন্য হচ্ছে। যার ফলে সেই অচেনা-অজানা নীরব নিথর কাদিয়ান গ্রাম আজ জনাকীর্ণ এবং কোলাহলময় নগরীতে পরিণত হয়েছে। এমনিভাবেই তাঁর রেখে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণীগুলি দিনের পর দিন পূর্ণ হয়ে চলেছে। আশা করি সত্য যাচ্ঞাকারীরা তা থেকে সবক হাসিল করবেন।

এ ব্যাপারে ৪র্থ শর্ত হলো ঃ খোদাতাআলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল্ কুরআনে বলেছেন (অর্থাৎ) "এবং সে যদি কোন কথা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিতাম, অতঃপর আমরা তাহার জীবন শিরা কাটিয়া দিতাম, তখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহই তাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতে না" (৬৯ঃ৪৫-৪৮)। পক্ষান্তরে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আগত বলে দাবী করে প্রায় ৩০ বছর কাল যাবৎ জীবিত থেকে খোদার রাজ্যে খোদার নামে ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে গেছেন অথচ সেই খোদার পক্ষ হতে তাঁর উপর কোন প্রকারের কোন নিষেধাজ্ঞা ও আসে নি, কোন প্রকারের কোন সাজা শাস্তিও নিপতিত হয় নি। বরং সেদিন অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে তিনি যে কাজটি শুধু মাত্র তাঁর ৪০ জন অনুসারীর সমন্বয়ে শুরু করেছিলেন আজ তার সংখ্যা কোটি কোটিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর পঞ্চ মহাদেশে পৌছে প্রায় পৌনে দু'শত দেশের মাটিতে ভূমিকম্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর দাপটে তাঁর শান, মান ও মর্যাদার শ্লোগান ধ্বনিত হচ্ছে, যা স্বয়ং খোদার হস্তের কাজ বলে তিনি দাবী করেছেন। তিনি এ-ও বলেছেন, "হে আমার প্রতিপক্ষগণ! আমি কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হব না বরং বিজয় লাভ করব। পক্ষান্তরে আমার বৈরীগণই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে" এহেন দাবী সত্ত্বেও খোদা যাঁকে পরিত্যাগ করেন নি, তাঁকে পরিত্যাগ করা কি মানুষের দ্বারা সম্ভব। মোটেই নয়। সুতরাং খোদা-প্রদত্ত কুরআনের সেই শর্তমূলে কি আমরা তাঁর দাবীকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে পারি না? এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, তিনি অলীক দাবীদার নন? তাকওয়াশীলগণ নিশ্চয় তা অনুধাবন করবেন।

সত্য নিরূপণের ৫ম শর্ত হলো ঃ দাবীকৃত ব্যক্তিকে চেনা এবং তাঁর দাবীর সত্যতা নিরিখে পূর্ববর্তী নবীর কোন ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে কিনা যার দ্বারা তাঁকে যাচাই করা যায়। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর পূর্ববর্তী রসূল তাঁরই আধ্যাত্মিক পিতা নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আরবী (সঃ) হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে চেনা ও জানার প্রয়োজনে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন তা হলো, "তিনি জময জন্ম গ্রহণ করবেন, 'কাদা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর মুখের দক্ষিণ চিবুকে একটি কালো তিল বিদ্যমান থাকবে, কথা বলার কালে তিনি মুখে কিছুটা জড়তা অনুভব করবেন, সে সময় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে, বেশি বেশি বন্যা ও ভূমিকম্প হবে। তখন পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সমাজের নেতারা ফাসেক হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সততার অভাব হবে, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করবেন এবং তাঁর নাম হবে "আহমদ"। ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া তাঁর সত্যতার পক্ষে আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যে সম্পর্কে বলতে গিয়ে রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "আমার মাহদীর সত্যতার স্বপক্ষে এমন একটি নিদর্শন প্রদর্শন করা হবে যা পৃথিবী সৃষ্টি অবদি কখনও কারো জন্য সংঘটিত হয় নি আর তা হলো, একই রমযান মাসে ব্যতিক্রম তারিখে দাবীকারকের উপস্থিতিতে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ লাগা। এ ক্ষেত্রে আমার বৈরী বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সবিনয়ে বলতে চাই যে, আপনারা উদ্বৃত এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটাকেই অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে পরখ করে নিন। আমি খোদার শপথ নিয়ে বলছি উক্ত সব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটাই যথাসময়ে ও যথাযথভাবে পাই পাই পূর্ণ হয়েছে। ১৮৯৪ এবং ১৮৯৫ সালে যথাক্রমে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে সেই ব্যতিক্রমধর্মী চাঁদ সুরুজের গ্রহণও সংঘটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন কিছুতেই কোন দূরভিসন্ধি নেই। বিশ্বাস না হয় সমসাময়িককালের পত্র-পত্রিকা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর সাহায্য নিন আর তা কেবল আহমদীয়া জামাতেরই নয় বরং বিশ্বের সকল দেশের সকল তথ্য ভান্ডারগুলি অনুসন্ধান করে আপনি নিশ্চিত হউন যে, আমি যা বলছি তা অভ্রান্ত কিনা।

লেখার কলেবরকে আর বৃদ্ধি না করার মানসে বক্তব্যের শেষটায় এসে আমাদের বিরুদ্ধবাদী বন্ধুদেরকে এ কথা বলেই শেষ করতে চাই যে, হে জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধবাদীগণ! হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী সত্য হলে তাঁকে গ্রহণ করা যেমনিভাবে আপনার নৈতিক দায়িত্ব তেমিনভাবে দায়িত্ব আমাদেরকে এই পথ থেকে ফিরিয়ে নেয়া যদি তাঁর দাবী মিথ্যা হয় (নাউযুবিল্লাহ্)। কোন দিক থেকেই আপনাকে আপনার দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি দেয়া হবে না। উভয় ক্ষেত্রেই আপনাকে সমভাবে দায়ী করা হবে এবং চরমভাবে এর জন্য জবাবদিহিতা করতে হবে। আপনার জন্য এ সংকট এড়ানোর উত্তমপন্থা হলো ইহাই যে, আপনি কোন প্রকার কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বে না ভুগে নিলয় কোণে নির্জ্জনে বসে বারি ধারা নেত্রে নিরঞ্জন দরবারে বিগলিত চিত্তে ক্রন্দন করতে থাকুন এবং এই বলে খোদারাহে নিবেদন করুন, "হে আমার পরম প্রিয় খোদা! আমি বিবেক-বুদ্ধিহীন তোমার এক অধম বান্দা। আমি তোমার একান্ত করুণা প্রত্যাশী হয়ে তোমারই সকাশে জানতে চাই যে, কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যাসত্যের মর্মকথা। হে আমার খোদা! এ ব্যাপারে তুমিই আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন কর এবং পুণ্য সুধা পানে তৃপ্তি দান কর।" তাহলে আপনি নিশ্চিত জানবেন যে, খোদা কি জামাতে আহমদীয়ার পক্ষে না অন্যদের পক্ষে। কারণ পবিত্র কুরআন বলে, (অর্থাৎ) "আর যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমাকে (হে মুহাম্মদ) প্রশ্ন করে, তখন (বলিও) আমি নিকটেই আছি, আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার জবাব দেই, যখন সে আমাকে ডাকে, সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়। আর আমার ওপরে ঈমান আনে যাহাতে তাহারা সঠিক পাথ পায়" (সূরাতুল বাকারা ঃ ১৮৭)।

- মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের ২১তম সালানা জলসা ২০০২-এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের ২১তম সালানা জলসার তারিখ নির্ধারিত ছিল ২৮ ও ২৯ মার্চ ২০০২ রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। এ সময়টায় আবহাওয়া অনেকটা উত্তপ্ত থাকার ফলে বৃষ্টির চাহিদা থাকে প্রকট। তাই প্রতিবারের ন্যায় এবারও ন্যাশনাল আমীর সাহেবের কাফেলা সুন্দরবন জামাতে পৌঁছিবামাত্র উত্তপ্ত আবহাওয়া শীতল করতে বৃষ্টি নামে। রাতেও ঝড়ো হাওয়াসহ মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়। বেশী বৃষ্টিপাত হলে অত্র অঞ্চলে চলাফেরা অচল হয়ে পরে বিধায় মহান আল্লাহ্‌তাআলার কৃপায় জলসার দিনগুলোতে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর মেহমানগণ যাতে চলাচলে কষ্ট না পায় বরং শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মাঝে জলসা শুনতে পারে ঠিক সে পরিমাপে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ঝড়ো হাওয়ার কারণে জলসার মূল প্যান্ডেল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় তা পুনর্মেরামতে সময় লাগার কারণে জলসার প্রথম অধিবেশন যথাসময় অর্থাৎ ২৮/৩/২০০২ বৃহস্পতিবার বেলা ৩.১৫মিঃ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, মোয়াল্লেম ও উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব তৌফিক আহমদ। এরপর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণে আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত মহতি জলসার গুরুত্ব ও নানাবিধ কল্যাণরাজী তুলে ধরেন এবং জলসায় যোগদানকারী অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ইহা কোন জাগতিক সভা সমাবেশ নয় পরন্তু মহান আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এহেন জলসার প্রচলন করেন। জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে দোয়া করে গেছেন তিনি তা পূনর্ব্যক্ত করে বলেন আমরাও যেন ঐসব দোয়ার ভাগীদার হতে পারি। এরপর তিনি মুনাজাত পরিচালনা করেন।

উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর

অতঃপর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। "কবুলিয়তে দোয়ার মাধ্যমে জীবন্ত খোদার পরিচয়"-এর উপর প্রদত্ত বক্তৃতায় মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক দোয়ার প্রকৃত হাকীকত ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য দোয়ায় কাঙ্খিত বিষয়ের সাথে আল্লাহ্‌-তাআলার সিফত ও গুণাবলীকে সমন্বয় রেখে গভীর আবেগ ও আবদারের সাথে দোয়া করতে থাকা এবং কোন অবস্থাতেই নিরাশ না হওয়া – এসবই দোয়া কবুলিয়তের শর্ত বলে তিনি উল্লেখ করেন। হযরত রসূল করীম (সঃ) ছাড়াও কুরআনে বর্ণিত বেশ কয়েকজন নবী / রসূল (আঃ)-এর উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষনীয় দোয়া, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দেরও কতিপয় আকর্ষনীয় দোয়া এবং বর্তমান যমানায় হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দোয়া ও তার কবুলিয়তের নিদর্শনাবলী অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী করে পরিবেশন করা হয়। এরপর বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব শাব্বির আহমদ। **"মালী কুরবানীর গুরুত্ব"** সম্বন্ধে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন জনাব এস. এম. আব্দুল আযীয, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ এবং নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। তিনি তার বক্তৃতায় আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ খরচ ও এর সুদূর প্রসারী কল্যাণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এরপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২য় ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ এবং সেক্রেটারী ন্যাশনাল জলসা কমিটি। তার বক্তব্যের পরপরই সুন্দরবন জামাতের ২১তম সালানা জলসার উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২য় ছাড়াও মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন স্থানীয় জামাতের আমীর এস এম আবু কাওসার এবং ঢাকা জামাতের আমীর, জনাব আফজল আহমদ খাদেম।

মাগরিব ও ইশার নামায জমা করে পড়ার পর জলসার মূল প্যান্ডেলে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় সন্ধ্যা ৬.৪০ মিনিটে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২য়। এ

অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জি, এম, ফিরোজ আহমদ ও নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান । **"হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন"** সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন মৌঃ এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম। **"মহানবী (সঃ)-এর জীবনাদর্শ"** সম্বন্ধে অত্যন্ত সারগর্ভ ও হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য রাখেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব। এরপর বাংলা নযম গেয়ে শুনান জনাব পানাউল্লাহ্ সাহেব। **"খাতামান্ নবীঈনের মকাম ও মর্যাদা"** সম্বন্ধে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। এরপরে অধিক রাত পর্যন্ত প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠান হয়। এ পর্বে প্রথমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে উক্ত জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি পড়ে শুনান মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ, মৌলবী আহমদ তারেক মোবাশ্বের। সকল প্রশ্নের যথোপযুক্ত ও হৃদয়গ্রাহী উত্তর প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মোবাল্লেগ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। আলোচনা শেষে সত্যানুসন্ধিৎসু ভ্রাতা ভগ্নিদের মধ্য থেকে ১৩ জন ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সত্যতা উপলব্ধিপূর্বক বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হন।

২৯/০৩/২০০২ইং শুক্রবার বিকেল ৩.১৫ মিনিটে মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২য়-এর সভাপতিত্বে জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। এতে কুরআন করীম থেকে তেলাওয়াত করেন সর্বজনাব জি, এম, ফিরোজ আহমদ ও উর্দূ নযম পেশ করেন তৌফিক আহমদ। **"তরবীয়তে আওলাদ"** সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন

জনাব জি, এম, মতিয়ার রহমান, **"প্রকৃত আহমদীর পরিচয়"** সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন জনাব মোবাশ্বেরুর রহমান, সদর আনসারুল্লাহ্ এবং **"ইসলামে নারীর মর্যাদা"** সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা। এরপর হিন্দী নযম শুনান মোহাম্মদ ইব্রায়েতুল হাসান। "বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ" সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের উদ্ধৃতি সম্বলিত তত্ত্ব ও তথ্যবহুল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব কওসার আলী মোল্লা সাহেব।

কলি যুগে কল্কি অবতারের আগমনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্তাআলার বিশেষ ইলহাম **"অ্যায় রুদ্র কৃষ্ণ রুদ্র গোপাল তেরী মহিমা গিতামে লিখ্খি গেয়ী"**-এর উল্লেখপূর্বক সারগর্ভ ভাষণ দেন। **"ইসলামী খেলাফত ও তার কল্যাণ"**-এর উপর মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেবের বক্তৃতার পর মাগরিবের সাথে এশার নামায জমা পড়া হয়।

অতঃপর লন্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা এম.টি.এ-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার শুনানোর ব্যবস্থা করা হয় জলসার ২টি প্যান্ডেলে। উল্লেখ্য এবারই প্রথম সুন্দরবন জলসায় মহিলাদের জন্য পৃথক প্যান্ডেল তৈরী করা হয়।

রাত ৮টায় মোয়াল্লেম মনীর হোসেন কর্তৃক উর্দূ নযম পেশের পর **"বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামাত"** সম্বন্ধে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল বক্তব্য রাখেন। এরপর নসীহ্তমূলক বক্তব্য রাখেন ও দোয়ার এলান করেন স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব এস, এম, আবূ কাওসার। অতঃপর সমাপনী ভাষণে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্তাআলার বিশেষ আশ্বাসবাণী **'ম্যায় তেরী তবলীগকো জমিনকী কিনারোঁতক পৌঁনছাওঙ্গা'**-এর বাস্তব নিদর্শন যে সুন্দরবন জামাত, তা উল্লেখ করে অত্র জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও অগ্রদূত মরহুম শামসুর রহমান (টি.কে)এবং প্রবীন আহমদী আবদুস সামাদ গাজী মরহুমের স্মৃতিচারণ করে তাদের কুরবানীগুলোকে স্মরণ করিয়ে তাদের জন্য দোয়ার আবেদন জানান। উভয় বুজুর্গ খানদানের সন্তানগণ বর্তমানে সুন্দরবন জামাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। পিতৃপুরুষের কুরবানীকে জাগরুক করা এবং বংশ পরম্পরায় তা অব্যাহত রাখার উপদেশ দান করেন। জামাতের সদস্যদেরকে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্র সৃষ্টির পরামর্শ দেন এবং অহমিকা নয় বরং নম্রতা, মায়া-মহব্বত ও মহানূভবতার মাধ্যমে জামাতের মধ্যে ঐক্যকে সুসংহত করতে সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বক্তব্যের পর পূর্বের মত প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে অনেক অ-আহমদী ভ্রাতার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। অতঃপর

১০ জন ভ্রাতা ও ১ জন ভগ্নি বয়াত গ্রহণ করেন। ন্যাশনাল আমীর সাহেব কর্তৃক পরিচালিত দোয়ার মাধ্যমে রাত সাড়ে ১১টায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের ২১তম সালানা জলসা সমাপ্ত হয়।

উক্ত জলসায় সুন্দরবন ছাড়াও ঢাকা, খুলনা, ঘড়িলাল, রঘুনাথপুর বাগ, উথুলী, চুয়াডাঙ্গা, তাহেরাবাদ, সৈয়দপুর জামাত থেকেও অগণিত নারী পুরুষের পাশাপাশি স্থানীয় ৬৫ জন হিন্দু, ২০০ জন মহিলা ও ৫০০ জন অ-আহমদী মেহমানসহ ২ সহস্রাধিক উপস্থিতি ছিল।

প্রতিবেদক, পাক্ষিক আহমদী

'ম্যায় তেরী তবলীগ কো যমীন কে কিনারোঁ তক্ পৌঁহ্চাউঙ্গা'

হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্তাআলার উপরোক্ত বাণীর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘড়িলাল ঃ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব

গত ২৯ মার্চ, ২০০২ শুক্রবার সুন্দরবন জামাতের ২১তম সালানা জলসার ২য় দিবস। ঘড়িলাল জামাতে নিয়োজিত মোয়াল্লেম নাসের আহমদ আনসারীর তথ্য থেকে জানা যায়, অত্র জামাতের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব নজরুল ইসলাম সাহেবের বৃদ্ধা মাতা বিশেষ মুখলেস মহিলা অসুস্থতা সত্ত্বেও জলসা কাফেলার সাথে সুন্দরবন জামাতে এসেছেন তার অন্তিম বাসনা শেষ সম্বলটুকু (চার বিঘা জমি) যথাশীঘ্র মহান আল্লাহ্তাআলাকে তোহ্ফা হিসেবে পেশ করার জন্য ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিতে। উল্লেখ্য তাঁর প্রয়াতঃ স্বামী ঘড়িলাল জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মরহুম ফজলুর রহমান সাহেব আল্লাহ্তাআলার জামাতকে ৫ বিঘা জমি দান করে গেছেন। নেকীর এ প্রতিযোগিতায় উক্ত মহিয়সী মহিলা স্বামীর চেয়ে পিছে পড়ে থাকায় অস্থির হয়ে ফিরছেন, কখন এবং কত শীঘ্র তার দান গ্রহণ করে তার অন্তিম বাসনা পূরণ করা হবে।

ঘড়িলাল জামাতের বর্তমান মসজিদের সামনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও সফরসঙ্গীগণ

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পূর্ব - পরিকল্পনা ছিল ২৮ ও ২৯ মার্চ ২ দিনের জলসা শেষে ৩০ মার্চ বন-জঙ্গল ঘেরা বঙ্গোপসাগরের উপকুলবর্তী নদীতে নৌ ভ্রমণে যাবেন; কিন্তু তার সাথে ঘড়িলাল জামাতের প্রেসিডেন্ট ও মোয়াল্লেম সাহেবের আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হ'ল, তিনি ঘড়িলাল জামাত পরিদর্শনে যাবেন। এ আনন্দে প্রেসিডেন্ট সাহেব ঘড়িলাল থেকে আগত অর্ধশতাধিকের কাফেলাকে রাতেই ট্রলারে ওয়ানা করিয়ে দিয়ে তিনি ও মোয়াল্লেম সাহেব ন্যাশনাল আমীর ও তাঁর কাফেলার সফরকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে বুড়িগোয়ালিনী নামক স্থানে নেমে ট্রলার ঠিক করে অপেক্ষা করতে থাকেন। উল্লেখ, উক্ত ট্রলারে পৌঁছতে সময় লাগে ৩ ঘন্টা অথচ গাড়ীতে লেগেছে মাত্র ৪০ মিনিট। এখানে থানা ও বি ডি আর ক্যাম্প রয়েছে। ক্যাম্প সংলগ্ন নিরাপদ স্থানে ড্রাইভার শিহাব ও সুন্দরবন জামাতের দেহাতী মোয়াল্লেম ইদ্রিস মোড়লকে গাড়ী প্রহড়ায় রেখে ট্রলারে আমরা ঘড়িলাল রওয়ানা হই। আমাদের সাথে ট্রলারে একজন অবসরপ্রাপ্ত বন কর্মচারী মাঝপথে তার গন্তব্যে যাবার উদ্দেশ্যে উঠেন। আলোচনায় জানা গেল, তিনি একজন জেরে তবলীগ। সুন্দরবন জামাতের আমীর জনাব এস এম আবু কাওসার সাহেব, ঘড়িলাল জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং মোয়াল্লেম নাসের আহমদ আনসারী বললেই তাকে চিনেন। আলাপে যখন তিনি শুনলেন, আমরা সুন্দরবন জামাতের জলসা করে ঘড়িলাল সফরে যাচ্ছি তখন তিনি অভিযোগ করে বললেন, আপনাদের লোক (দেহাতী মোয়াল্লেম) আমাকে জলসার তারিখ জানিয়ে আমাকে জলসায় নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন অথচ আপনারা বলছেন, জলসা শেষ করে ফিরেছেন অথচ আপনাদের কেউ আমাকে খবরটি পর্যন্ত দিলেন না। যাই হোক ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তার সাথে আধ ঘন্টা তবলীগী আলোচনার সুযোগ লাভ করি। তিনি অকোপটে স্বীকার করেন তার অতীতের দোষ-ত্রুটির কথা। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি যা-ই যতটুকু পারেন পরোপকার করে যাচ্ছেন। লোকটি শ্মশ্রুমন্ডিত সুন্দর চেহারার। আল্লাহ্তাআলা তাকে এবং তার এলাকায়

ট্রলার থেকে নামার পর ঘড়িলাল জামাতের উদ্দেশ্যে

তিনি মাঝপথে বিদায় নিয়ে ট্রলার থেকে নেমে যান। প্রায় দেড় ঘন্টা যাত্রার পর (স্রোতের বিপরীত যাত্রা নচেৎ এক ঘন্টার পথ) কপোতাক্ষ নদ অতিক্রম করে ট্রলারটি ঘড়িলালে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনার নির্ধারিত স্থানে থেকে গেলে আমরা নেমে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অনুসরণ করে হাঁটতে থাকি। রাস্তায় প্রথমেই পড়ে তাঁর অ-আহমদী শরীক ভাইদের বাড়ী (যারা প্রচ্ছন্নভাবে বিরোধিতা করে থাকে) পার হয়ে যাচ্ছি। এর মধ্যে তাদেরই আঙ্গিনায় ২টি গাছে ২টি বড় বড় মৌচাক দেখালেন এবং আমীর সাহেবের অনুমতি প্রার্থনা করলেন যে, তাৎক্ষণিকভাবে মৌচাক ভেঙ্গে মধু আহরণ করে দেবার। কিন্তু অনুমতি না মেলায় সম্ভব হয় নি। আর একটু এগুতেই তিনি একটি কবর দেখিয়ে বললেন, এটি তাঁর মরহুম পিতার কবর। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব কবর যেয়ারত করে দোয়া পরিচালনা করলেন। শুকনো মওসুম, তাই আমরা রাস্তা ছেড়ে আড়াআড়ি মেঠো পথে হেঁটে প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ী যাই। এখানে এ বাড়ীতে পূর্বালোচিত সনা-মধন্যা মহিলার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাদের কুরবানী ও ত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং রাস্তা সংলগ্ন দানকৃত জায়গায় একটি ঘর তুলে সেখানে ওয়াক্তিয়া নামাযের ব্যবস্থা করতে বলেন। এরপর আমরা আবারও মেঠো পথ ধরে জামাতের মসজিদে গমন করি। সেখানে এক সাথে কয়েকটি আহমদী বাড়ী। তবে নৌকায় একটি ছোট খাল পার হ'তে হয়। সেখানে গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম তারা বেশ বড় মাপের মসজিদ নির্মাণ করতে গিয়ে কোথাও ৫ ফুট ও কোথাও ৩ ফুট ১০" ইটের গাথুনি দিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ টাকার অভাবে কাজ বন্ধ রেখে টালীর ছাদ দিয়ে ছোট একটি অস্থায়ী মসজিদ বানিয়ে কোন রকমে নামায ও মক্তবের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে মহিলাদের কোন ব্যবস্থা নেই বরং ঐ জামাতের সকল পুরুষ সদস্যের স্থান সংকুলানও সম্ভব নয়। এখানে আমরা নামায যোহর-আসর জমা পড়লাম। এরপর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক বিষয় উল্লেখ করে নসিহত প্রদান করেন। খাকসার ২/১ কথা বলে ১টি বয়াত পরিচালনার পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়া পরিচালনা করেন। এখানে জামাতের সদস্যদের সাথে আমরা বর্তমান ও নির্মাণাধীন মসজিদের ছবি তুলি। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উক্ত জামাতের সদস্যদের দারিদ্রতা সত্ত্বেও তাদের ঐক্য এবং আন্তরিকতায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে আল্লাহ্‌তাআলা এত সুন্দর জামাত তৈরী করে রেখেছে সরজমিনে না দেখলে তো বিশ্বাসই হতো না। এ জামাতের প্রথম তবলীগ আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং তার ফিরিশ্‌তা দিয়ে সূত্রপাত করেন তাইতো বলা যায়, 'আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌছাব'-এর পূর্ণতার নিদর্শন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘড়িলাল। আল্লাহ্‌তাআলা এ জামাতের তরক্কী ও উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন এবং এ জামাতের অগ্রদূত মরহুম ফজলুর রহমান ও তার পত্নীকে জযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন- সুম্মা আমীন॥

নির্মাণাধীন মসজিদের পার্শ্বে

স্থানীয় সদস্যদের সাথে সভা

ঘড়িলাল জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্টের কবর জিয়ারত

প্রতিবেদক ঃ পাক্ষিক আহমদী

কাশ্মীর উপত্যকায় প্রথম দায়ী ইলাল্লাহ্‌ঃ

হযরত মাওলানা মাহবুব আলম (রাঃ)

হযরত মাওলানা মাহবুব আলম পাঞ্জাবের গুজরাত জেলার চক পিরানা গ্রামের অধিবাসী। সেখান থেকে কাশ্মীর রাজ্যে আসেন। তিনি কাশ্‌ফ, রুইয়া ও দোয়া গৃহীত হওয়ার মর্যাদাপ্রাপ্ত বুযূর্গ। জ্ঞান ও শিক্ষা, ভক্তি ও তাকওয়া, ইবাদত ও সাধনা এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। লোকে তাঁকে আল্লাহ্‌র ওলী বলে সম্বোধন করতো। তাঁকে দেখে সকলে সম্মান জানানোর জন্য উঠে দাঁড়াতো। জম্মু ও কাশ্মীরের আহমদীয়তের ইতিহাসের রচয়িতা কোরেশী মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ্‌ লেখেন ঃ "তিনি গুজরাত থেকে কাশ্মীরে আসেন। বয়াত করে তিনি আহমদীয়তের একজন উদ্যমী মোবাল্লেগ হন। দরস ও শিক্ষা দানে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর অনেক ছাত্র আহমদী হয়। পুরো এলাকায় তাঁর ওয়াজ ও তবলীগে অনেক বড় বড় জামাত কায়েম হয়। তিনি সম্মানী, প্রভাবশালী ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন।

বংশ পরিচয় ঃ হযরত মাওলানা মাহবুব আলমের পূর্ব-পুরুষের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন হাফেয সদর উদ্দিন, যিনি হিন্দুস্থানের বিখ্যাত গদ্দীনশীন বুযূর্গ ও সুফী উপ-মহাদেশে ইসলামের প্রচার করেন।

হযরত হাফেয সদর উদ্দিন দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র দীনের প্রচারের জন্য পাঞ্জাব অভিমুখী হন। তবলীগের আবশ্যিক কাজ শেষে গুজরাতের মীয়ানা চক ডুহুতে স্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে ৪০ টার মত গ্রামের লোক তাঁর মুরীদ হয়। এভাবে এখানে তিনি গদ্দীনশীন পীর হয়ে যান এবং এক বড় জমিদারীর মালিক হন। এ এলাকার লোক তাঁর কাছ থেকে সঠিক পথের সন্ধান পেতো এবং তাঁর কাছে ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করতো। সমস্ত এলাকায় এ বংশের লোকেরা মাওলানা মিয়াঁ কাযী ওস্তাদ চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হয়। হযরত হাফেয সদর উদ্দিন এখানে মৃত্যুবরণ করেন।

জন্ম ও শিক্ষা ঃ হযরত হাফেয সদর উদ্দিনের সন্তান-সন্ততি গুজরাত জেলায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এ পরিবারের লোকজন এলাকায় ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করেন। জেনারেল আইয়ুব খানের শাসন আমলে মিয়াঁ ফিরোজ আলম সাহেবের তত্ত্বাবধানে সতেরটি গ্রাম ছিল। তিনি এলাকার ধনী লোক ও মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। মিয়াঁ সাহেব মাওলানা মাহবুব আলমের ভাইপো ছিলেন।

হযরত হাফেয সদর উদ্দিনের বংশের হযরত মিয়াঁ সরফুদ্দীনের ঘরে হযরত মাওলানা মাহবুব আলমের জন্ম আনুমানিক ১৮৫০ সালে। হযরত মিয়াঁ শরফুদ্দীন নিজে শিক্ষিত ছিলেন। সেজন্য তিনি নিজের ছেলের শিক্ষা ও তরবিয়তের ওপর বিশেষভাবে লক্ষ্য দেন। হযরত মাওলানা মাহবুব আলম তাঁর মায়ের নির্দেশে শিক্ষা গ্রহণের জন্য দীর্ঘ ও কষ্টকর ভ্রমণ করেন। সব রকমের কষ্ট স্বীকার করেন। অনেক সময় অনাহারে থাকতে হয়েছে। কিন্তু কখনই সাহায্যের জন্য হাত পাতেন নি। শ্রমিকের কাজ করেও নিজের খোরপোষের ব্যবস্থা করতেন। হযরত মাওলানা সাহেব সাহারনপুর, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে গিয়ে আলেম ও বুযূর্গের কাছে জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর যোগ্যতা ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সমকালীন লোকেরা স্বীকার করতো। অনেক মামলা ফয়সালার জন্য আদালতের জজেরা তাঁর সাহায্য নিতেন। যে সিদ্ধান্ত তিনি দিতেন তা সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'ত এবং প্রতিপক্ষ ভাল মনে গ্রহণ করতো। জজ ঠাকুর দামন সাহেব আদালতে নিজের চেয়ারে হযরত মাওলানা সাহেবকে বসিয়ে মুসলমানদের একটি সংগীন বিরোধের মীমাংসা করেন।

কাশ্মীরে দরস ও শিক্ষাদানের ধারাবাহিকতা ঃ

হযরত মাওলানা মাহবুব আলম আনুমানিক ১৮৭৫ সালে তাঁর শিক্ষা জীবন শেষ করে পর্যটক হিসাবে কাশ্মীর ভ্রমণে আসেন। এ ভূখন্ডের ধর্মীয় অবস্থা দেখে তিনি ব্যথিত হন এবং কাশ্মীরকে ধর্মের প্রচারের জন্য বেছে নেন। কুরআনের নূর দ্বারা এ ভূখন্ডকে আলোকিত করাকে তিনি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। এরপর বছরের বেশির ভাগ সময় কাশ্মীরে কাটাতেন। কেবল ২/১ মাসের জন্য গুজরাতে তাঁর জমি-জমা দেখার জন্য যেতেন। কাশ্মীরে দরস ও শিক্ষাদানের কাজ ধারাবাহিকভাবে চালাতেন। আহমদীয়ত গ্রহণ করার পর হযরত মসীহ্‌ মাওউদের (আঃ) নির্দেশক্রমে তাঁর শিক্ষার কাজে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়, যা তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত খুবই সফলভাবে চালু থাকে (সংক্ষিপ্ত তারিখে আহমদীয়ত জম্মু ও কাশ্মীর)।

কাযী ফযলদীন মরহুম যিনি রাদুরীর একাকীত্ব ত্যাগ করে পুঞ্চ জেলাতে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর হযরত মাওলানা মাহবুব আলমের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর তাকওয়া ও কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাথে নিজের মেয়ে মোহতারেমা সারা বিবি সাহেবার সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের সময় মেয়ে বাপের কাছে বলে পাঠায় যে, মোহর এই ধার্য করা হোক যে, যতদিন আমি বাঁচবো, আমার স্বামী যেন আমাকে কুরআন পড়াতে থাকেন। সুতরাং কুরআন শিক্ষা মোহরানা হিসেবে রাখা হয়। এ যুগল কুরআন শেখা, শেখানো ও এলাকাকে কুরআনের আলোকে আলোকিত করার কাজে সারা জীবন ব্যয় করেন।

হযরত সারা বিবি ছোটবেলা থেকে খুব ইবাদত-গুজার, ধর্মনিষ্ঠ, পবিত্র ও দোয়া কবুলিয়তের মর্যাদাপ্রাপ্ত বুযূর্গ মহিলা ছিলেন। চেনা-অচেনা সকলে তাঁকে মা-জী বলে সম্বোধন করতো। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি তার নিবিড় ভালবাসা ছিল। আফসোস, দেশ ভাগের সময় এ সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৯৪৭ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আহমদীয়ত গ্রহণ ঃ

হযরত মাওলানা মাহবুব আলম (রাঃ) যুগের অবস্থা লক্ষ্য করে বলতেন, এযুগ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত সংস্কারকের আগমন প্রত্যাশী। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর কাছে ধীরে ধীরে রুইয়া ও কাশ্‌ফের মাধ্যমে প্রকাশ করেন যে, ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) আগমন হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইঙ্গিত অনুসারে তাঁর মনোযোগ হযরত মসীহ্‌ মাওউদের (আঃ) দিকে যায়। সত্য সন্ধানের জন্য কাশ্মীরের দুর্গম রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে ঝিলাম পৌছান। তিনি হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দিনের সাথে সাক্ষাত করে জানতে পারেন, তিনি বয়াত করেছেন। হযরত মাওলানা বলেন, তাঁর বয়াত গ্রহণে তাড়াতাড়ি করা ঠিক হয় নি। হাদীসের নিদর্শনগুলো পরীক্ষা করে এক সাথে বয়াত নেয়া উচিত ছিল। হযরত মৌলভী বোরহান সাহেব বলেন, "আমি এখন বয়াত গ্রহণ করেছি। আপনি যেমনভাবে চান পরীক্ষা করুন।"

হযরত মাওলানা মাহবুব আলম সাহেব হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে বাহাস করার মানসে লাহোর যান। সে সময় অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে হুযূর আকদস (আঃ) লাহোরে ছিলেন (মুজাদ্দিদে আযম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬১)।

মৌলভীরা বিরোধিতার ঝড় তোলে। তারা লোকদেরকে হুযূর আকদসের (আঃ) কাছে আসতে বাধা দিত আর বলতো, মির্যা সাহেব একজন যাদুকর। তোমরা যাদু হয়ে যাবে। তাঁর মনে পড়ে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) এক নিদর্শন মৌলভীদের বিরোধিতা ও অস্বীকার বলে উল্লেখ করেন। মৌলভীদের শোরগোল থেকে প্রকাশ পায় যে, দাবীকারক সত্য। তিনি অগ্রসর

হন। অনেকে তাঁকে বাধা দিতে চায়। অনেকে বলে ওঁকে যেতে দাও, তিনি নিজের যাদুতে মির্যা সাহেবকে ঠিক করে নেবেন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদের (রাঃ) নিকট বসেন। "নিদর্শন তোতলামী আর উরুর ওপর হাত মারা" মনে রাখেন। এ নিদর্শন পূর্ণ হতে দেখে তিনি বিশ্বাস করে নেন অন্য নিদর্শন সত্য হবে। আর তাঁর মনে হয় ও আলোকিত মুখমন্ডল নিশ্চয় সত্যবাদীর। তিনি বাহাস শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকেন। হুযূর আকদসের (আঃ) প্রতিটি কথা তাঁর হৃদয়ে আঘাত করতে থাকে। যখন মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর মাহাত্ম্যপূর্ণ বক্তব্য শেষ করেন তখন মাওলানা সাহেবের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তিনি জবাই করা মুরগীর মত ছটফট্ করতে করতে হুযূর আকদসের (আঃ) পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। চোখ থেকে পানি ঝরতে থাকে এবং হিক্কা উঠতে থাকে। কিছুটা শান্ত হয়ে তিনি উঁচু স্বরে বলেন, "হে খোদার সত্য ইমাম মাহ্দী আমি খাকসার মুহাম্মদ কাশ্মীরের উঁচু আর বিশাল পাহাড় পার হয়ে, কখনও কখনও ক্লান্ত হয়ে বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এসেছি। হে ইমাম! আপনার সমীপে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ থেকে 'আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু উপহার আপনার খেদমতে পেশ করছি'। এভাবে তিনি বয়াতের সৌভাগ্য পান এবং আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হন। মাওলানা মুহাম্মদ আসাদউল্লাহ্ কুরায়েশী লেখেন ঃ "স্বপ্নে দেখি মসীহ্ মাওউদের (আঃ) আবির্ভাব হয়েছে। আযানের পর সন্ধান ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমার শিক্ষক হযরত আহমদ দীন সাহেব এবং হযরত মাওলানা বোরহান উদ্দিন সাহেব ঝিলামীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। জানা যায় তাঁরা উভয় বুযূর্গ আহমদীয়তে দাখেল হয়েছেন। বলা হয়, আপনারা ব্যস্ততার সাথে কাজ করেছেন। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, কুরআন মজীদের নিদর্শন অনুসারে পরীক্ষা করে একত্রে পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল। তাঁরা বলেন, আমরা তো গ্রহণ করেছি। আপনি নিদর্শন অনুসারে পরীক্ষা করুন। এ সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লাহোরে আসেন। ১৮৯৭ সালে তাঁর হাতে বয়াত করা হয়। কিন্তু ১৯০৬ সালের বয়াতকারীদের তালিকায় তাঁর নাম আছে (তারীখে আহমদীয়ত জম্মু ও কাশ্মীর পৃষ্ঠা ৫০-৫১)।

কাশ্মীরের সত্য প্রচারের নতুন অধ্যায় ঃ

হযরত মাওলানা সাহেব পূর্বেই সত্য প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। আহমদীয়ত গ্রহণের পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইরশাদ করেন, "রিয়াসত কাশ্মীরে আপনার শিষ্য ও মুরীদ পাওয়া যায়। আপনি তাদের কাছে গিয়ে তবলীগ করুন"। এভাবে কাশ্মীরে আহমদীয়তের প্রচার ও তবলীগের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তিনি বেশির ভাগ সময় সত্য প্রচারে ব্যয় করতেন। এজন্য দিন রাত এক করে দেন। তবলীগের এক উন্মাদনা ছিল এবং তিনি প্রতি মুহূর্তে কুরআনের আলোকে আশ পাশ এলাকা উজ্জ্বল করতেন। প্রথম প্রথম ২/১ মাসের জন্য গুজরাতে তাঁর জমিজমা দেখার জন্য আসতেন। ধর্মকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেয়ার প্রতিজ্ঞা তাঁকে উদাসীন করে দেয়। তিনি দেশের চিন্তা ছেড়ে দেন। কাশ্মীর থেকে সালানা জলসার সময় কাদিয়ানে আসতেন এবং ফেরত গিয়ে আরো বেশি কাজ করতেন। হযরত মৌলভী সাহেব বয়াত করে এসে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সত্য প্রচারের মাধ্যমে তবলীগের কাজ শুরু করেন। প্রথমে তাঁর স্ত্রী মোহতারেমা সারা বিবিকে বোঝানোর জন্য কোমর বাঁধেন। কিন্তু তিনি তা শোনেন নি। তিনি বলেন, আপনি আমাকে বলুন আপনি বয়াত করেছেন কিনা।

তিনি বলেন "হ্যাঁ"। সারা বিবি বলেন "আমার দলিলের প্রয়োজন নেই। আমি সম্পূর্ণ আপনার সাথে আছি। আমার বয়াতের চিঠি লিখে দিন। কিন্তু রুইয়া দ্বারা আমার খোদা আমার কাছে ইমাম মাহ্দী (আঃ) আসার সত্যতা প্রকাশ করেছেন, আল্হামদুলিল্লাহ্। এরপর তাঁর ভাইপো মৌলভী আব্দুল হক সাহেব, ভাই মির্যা নেক আলম বারেক, মৌলভী আব্দুল হালীম সাহেব বিবাহ সম্পর্কিত ভাই কাযী আব্দুল্লাহ্, কাযী ইব্রাহীম এবং অন্যান্য আত্মীয়রা আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। তখন তিনি অন্য লোকদের দিকে প্রচেষ্টা চালান। আল্লাহ্র ফযলে সকল স্তরের এবং সকল পেশার চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে আছেন মৌলভী আল্লাহ্দাদ, চৌধুরী গদ্দী, চৌধুরী মঙ্গু, মৌলভী হোসেন মুহাম্মদ, মিয়াঁ গামা, মৌলভী ইমাম দীন, কাযী ফিরোজ উদ্দিন, কাযী বাহাদুর আলী, কাযী নূরুদ্দীন, মির্যা ফিরোজ উদ্দিন আরেফ, মিয়াঁ খুজু, মিয়াঁ রাজু, মিয়াঁ করমদীন খোকর, হাদী আমীর আলি, মুন্সী আলমদীন, মাষ্টার আলিফ দীন, মৌলভী ফকির মুহাম্মদ, মোসাম্মাৎ রানী, মোসাম্মাৎ জেঠি কাদিয়ানে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) হাতে বয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মৌলভী সাহেব এদের নিজের সাথে নিয়ে যান। কাযী ফিরোজ উদ্দিনের হাঁপানি রোগ ছিল। হুযূরের (সঃ) কাছে দোয়ার দরখাস্ত করা হয়। হুযূরের (সঃ) দোয়ার ফলে চিরতরে এ কষ্টকর রোগ থেকে তিনি সুস্থ হয়ে যান।

তাঁর বিরুদ্ধাচরণ এবং ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন ঃ

তাঁর শিষ্যদের এক অংশ আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। আর এক অংশ বিরোধিতার চরমে পৌছায়। বিরোধিতার এ ঝড় তাঁর চলার পথ বন্ধ করতে পারে নি। তিনি ধৈর্য ও সংযমের সাথে তবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকেন। আল্লাহ্তাআলার ফযলে কোটল, মীরপুর, পুঞ্চ প্রভৃতি। জেলাতে অসংখ্য বড় বড় জামাত কায়েম হয় যেমন গোয়ী, কোটল, টায়েঁ, মনকট, সালাওয়া, ভাবড়া, আরামবারী, খায়ের নড়ী প্রভৃতি। জম্মু ও কাশ্মীরের আহমদীয়তের ইতিহাস প্রণেতা লেখেন ঃ "আহমদীয়ত গ্রহণের পর ফেরত এলে তাঁর বিরুদ্ধে ফতওয়া লাগানো হয়। চারদিকে বিরোধিতার ঝড় ওঠে। ভয়ঙ্কর বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। কিন্তু তিনি সকল দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করেন। সত্যের প্রচার করতে করতে অবিচলভাবে এগিয়ে চলেন। সামান্যতম পদচ্যুতি হয় নি। এ সময় বিরোধিতা ও বয়কটের কারণে অনেক সময় গম না ভাঙ্গিয়ে মিল থেকে ফেরত আসতে হ'ত। সব রকমের কষ্ট দেয়া হয়েছে। খারাপ খারাপ গালিও শুনতে হয়েছে। মসীহে মাওউদের (আঃ) উপদেশ "গালি শুনে দোয়া দাও, দুঃখ পেয়ে আরাম দাও" অনুসারে দোয়ার ওপর জোর দেয়ার অভ্যাস নিজের মধ্যে গড়ে তোলেন।

একবার তিনি কুলটিতে নামায পড়ার জন্য এক মসজিদে প্রবেশ করলে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়া হয়। এখানে তাঁর কোন বন্ধু বা সমবয়সী ছিল না। অনেক বন্ধুকে বাধ্য হয়ে ফতোয়ার কারণে বিরোধিতা করতে হয়।

তিনি সেখানে সারারাত এক খোলা স্থানে নামায পড়ে কাটান। এখানে করমদীন খোকর তাঁর তবলীগে প্রভাবিত হন এবং পরে আহমদীয়ত গ্রহণ করেন।

যে পল্লীতে অবস্থান করতেন সেখানে তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছে, শেষে ওখান থেকে তাঁকে বের করে দেয়া হয়েছে। পূর্বের স্থানেও এরূপ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সেখানে যেতেন দুঃখ-যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হ'ত। অনেক ঝরণা থেকে তাঁকে পানি নিতে নিষেধ করা হয়।

তাঁর এরূপ পদ্ধতি ছিল যে, কোন এলাকায় ঝরণার ধারে গাছের ছায়ায় কিছু স্থান সমতল করে বসে যেতেন। এখানে তবলীগের কাজ শুরু করতেন। এখানে নামায পড়তেন। সেখানে জামাত কায়েম হয়ে যেত। তখন পরের স্থানে পরে আরও পরের স্থানে যেতেন। এরূপে গ্রামের পর গ্রাম এবং এলাকার পর এলাকা আহমদীয়তের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন। আবার তাদের দেখা-শুনা ও তরবিয়তের ব্যবস্থা করতেন। অনেককে প্রশিক্ষণ দিয়েও এ কাজ করানো হ'ত। (চলবে)

মূল ঃ আব্দুল ওহাব আহমদ
অনুবাদ- কওসার আলী মোল্লা

হযরত মূসা (আঃ)

(৩য় কিস্তি)

মূর্তি পূজা ঃ মানুষ সাধারণতঃ পারিপার্শ্বিকতার দাস হয়ে থাকে। পরাধীন জাতির জন্য একথা অধিক সত্য, কারণ তারা শাসকগণের আচার- আচরণ ও রীতি-নীতি অনুকরণ করে থাকে। বনী ইসরাঈল জাতি দীর্ঘকালব্যাপী ফেরাউনদের শাসনাধীন দাসত্বের জীবন-যাপন করে। স্বাভাবিকভাবেই তারা মিশরীয়দের পৌত্তলিক বিশ্বাস ও আচার-আচরণকে প্রায় আত্মস্থ করে নিয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে মিশর ছেড়ে লোহিত সাগর পার হয়ে যাওয়ার পর পথে এমন এক জাতির নিকট এসে উপস্থিত হ'ল যারা তাদের প্রতিমাসমূহের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন ছিল। তারা বলল, হে মূসা! আমাদের জন্য এরূপ উপাস্য তৈরী করে দাও যেরূপ উপাস্য তাদের আছে।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, নিশ্চয় তোমরা একটি অজ্ঞ জাতি! নিশ্চয় তারা যাতে লিপ্ত আছে উহা ধ্বংস করা হবে এবং তারা যা কিছু করছে তা বৃথা যাবে। আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য উপাস্য অন্বেষণ করব। অথচ তিনি তোমাদিগকে সকল জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন? এবং স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতির হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, যারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদিগকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখত। এবং এর মধ্যে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক মহা পরীক্ষা ছিল।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা সেই পবিত্র ভূমি কেনানে প্রবেশ কর যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবধারিত করেছেন এবং আল্লাহ্তাআলা একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তোমরা যদি সাহসিকতার সাথে পবিত্র নগরে প্রবেশ কর, তাহলে আল্লাহ্তাআলা তোমাদিগকে বিজয় দান করবেন। অতএব তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যেও না, অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে।

তারা বলল, হে মূসা! নিশ্চয় তথায় আমলেকীয় ও অন্যান্য দুর্ধর্ষ আরবগোত্রগুলি এ পবিত্র নগরের অধিবাসী। আমরা তাদিগকে ভীষণ ভয় করি। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সেই স্থান থেকে বের হয়ে যাবে, আমরা তথায় কখনও প্রবেশ করব না। সুতরাং যদি তারা সেখান থেকে চলে যায় তাহলে নিশ্চয় আমরা তথায় প্রবেশ করব। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দু'জনেই যুদ্ধ কর নিশ্চয় আমরা এখানেই বসে থাকব।

তখন হযরত মূসা (আঃ) বললেন, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি আমার নিজের ও আমার ভ্রাতার উপর ব্যতীত কারও উপর অধিকার রাখি না; সুতরাং তুমি আমাদের এবং বিদ্রোহপরায়ণ লোকদের মধ্যে পার্থক্য করে দাও।

ফলে কিছু সংখ্যক ইসরাঈলীর ভীরুতা এবং তাদের নবীর প্রতি তাদের অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের জন্য আল্লাহ্তাআলা তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশকে চল্লিশ বছর পিছিয়ে দিলেন। তাদিগকে চল্লিশ বছর ধরে মরুভূমিতে যাযাবরের জীবন যাপন করতে হয়েছে। অবশ্য এই যাযাবর জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলা তাদের মধ্যে নূতন জীবনের প্রেরণাও সৃষ্টি করেছিলেন। কর্ম-বিমুখতা, আলস্যপরায়ণতা ও ভীরুতার মনোবৃত্তি দূর করে তাদের কর্মস্পৃহা, প্রতিরোধশক্তি ও অন্যান্য নৈতিকগুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, যার ফলে অব্যাহত পরবর্তী বংশ শৌর্য ও সাহসিকতার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা প্রতিশ্রুত ভূমি জয় করতে সক্ষম হয়।

হযরত মূসা (আঃ) লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'আয়লা' নামক শহরে উপস্থিত হন। ইহা লোহিত সাগরের উত্তর-পূর্ব শাখায় "আয়েলা নিটক" উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এবং ইসরাঈল জাতির উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবার এই শেষ সীমা বলে উল্লেখিত হয়েছে। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সময়ে এ শহর ইসরাঈলীদের অধিকারভুক্ত হয় কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। পরে উহা পুনর্বিজয় করেছিল।

ইসরাঈলীগণ অতি দীর্ঘকাল যাবৎ ফেরাউনদের অত্যাচারে শৃংখলাবদ্ধ থাকার পরিণতিতে তারা পুরুষোচিত ঐ সকল গুণাবলী হারিয়ে বসেছিল যা একটি জাতিকে পরিশ্রমী নির্ভীক এবং শৌর্যপূর্ণ করে তোলে। ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের জন্য কেনানে জয় করে রাজত্ব করা নির্ধারিত ছিল। অতএব হযরত মূসা (আঃ) তাদিগকে মিশরের বাইরে লয়ে আসার পর তাদিগকে দিসনাই অঞ্চলের রৌদ্র-দগ্ধ অনুর্বর অঞ্চলে বাস করতে হয়েছিল যাতে তারা উন্মুক্ত ও কষ্ট-সাধ্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে এবং এরূপে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য অত্যাবশ্যক গুণাবলী ও যোগ্যতা অর্জন করে তারা উন্নতি করতে পারে। কিন্তু সুদীর্ঘ কালের দাসত্ব বন্ধনে থেকে তারা সর্বপ্রকার উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল এবং অস্বাভাবিক অনুদ্দীপক এবং নিস্তেজ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

এমতাবস্থায় তারা যখন দেখল যে, মরুভূমি ও নির্জন প্রান্তরে তাদিগকে বাস করতে হবে, যেখানে জীবনের কোন সুখ-সুবিধা পাওয়ার কোন অবস্থা ছিল না, এমন কি খাদ্যেরও অভাব ছিল, তখন তারা আতঙ্কিত ও অস্থির হয়ে উত্তেজিত হ'ল। তারা মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে এ বলে কলহে লিপ্ত হয়েছিল। তারা বলছিল, হায় হায়! আমরা মিশর দেশে সদাপ্রভুর হস্তে কেন মরি নি? তখন মাংসের হাঁড়ির কাছে বসতাম, তৃপ্তি পর্যন্ত রুটি ভোজন করতাম; তোমরা তো ক্ষুধায় মেরে ফেলতে আমাদিগকে বের করে এ প্রান্তরে এনেছ।

আল্লাহ্তাআলা তাদের বিড়বিড়ানি শুনলেন এবং এ অকৃতজ্ঞ লোকদিগকে বলার জন্য হযরত মূসা (আঃ)-কে আদেশ করলেন ঃ আমি ইসরাঈল সন্তানদের বচ্সা শুনেছি। তুমি তাদিগকে বল, সন্ধ্যাকালে তোমরা মাংস ভোজন করবে ও প্রাতঃকালে অন্নে তৃপ্ত হবে, তখন জানতে পারবে যে, আমি সদা প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর।

ঝরণা ঃ একদিন হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতি তার নিকট পানি চেয়েছিল তখন আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত মূসা (আঃ) লাঠি

দ্বারা এক বড় পাথরের উপর আঘাত করলেন, অতঃপর উহা থেকে বারটি ঝরণা নির্গত হয়ে সজোরে প্রবাহিত হ'ল। প্রত্যেক গোত্র স্ব স্ব ঘাট চিনে নিলো। এবং আল্লাহ্ তাদের উপর মেঘের ছায়া করে দিলেন এবং তিনি তাদের জন্য 'মান্না' অর্থাৎ মধু বা শিশির অথবা বেঙের ছাতা এবং 'সাল্ওয়া' অর্থাৎ তিতিরের মত সাদা ধরনের পাখী যা আরব দেশে বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যায় এবং পাশাপাশি দেশগুলোতেও দেখা যায় তা নাযিল করে দিলেন এবং আল্লাহ্ বললেন, তোমাদিগকে যে পবিত্র রিয্ক দিয়েছি উহা থেকে খাও এবং যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়িও না।

এখন ঐ ঝরণাগুলির চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে নেই। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কেননা, এখনও সুনির্দিষ্টভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় নি, কোন্ স্থানটি দিয়ে হযরত মূসা (আঃ) এই ভ্রমণটি সম্পন্ন করেছিলেন। তাছাড়াও সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা যায় ধীরে ধীরে ঝরণা ধারার উৎস মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এখানে বর্ণিত ঘটনা, হাজার হাজার বছর পূর্বে ঘটেছিল।

এ-ও জানা কথা যে, সময় সময় ঝরণা হঠাৎ করে প্রবাহিত হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এমন কি শুষ্ক হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে, ঝরণার চিহ্ন সেখানে থাকে না। বলা হয়েছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বারটি ঝরণা সেখানে প্রবাহিত ছিল। পাহাড়টি আরব দেশের সীমানার মধ্যেই অবস্থিত এবং আরবের লোকের তা দেখেছেন, এবং রসূল করীম (সঃ) স্বয়ং উহা দেখছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এক ব্যক্তি ঐ অঞ্চল ভ্রমণ করে এসে বলেছেন, তিনি স্বয়ং একটি বিরাট পাথর থেকে ১২টি স্রোত ধারা নির্গত হতে দেখেছিলেন। ইসরাঈলের বারটি গোত্রের সংখ্যার সাথে এই সংখ্যার মিল আছে। হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র ছিল, তাই আল্লাহ্তাআলা বারটি ঝরণাও প্রবাহিত করেছিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে যারা সত্যের সাহায্যে হেদায়াত পেতে ছিল এবং উহার সাহায্যে ন্যায় বিচার করতে ছিল। এবং তাদের মধ্যেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রূপে বারটি গোত্র বিভক্ত হয়েছিল।

তখন তারা বলেছিল, হে মূসা! আমরা একই প্রকার খাদ্যে আদৌ ধৈর্য ধারণ করতে পারব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য দোয়া কর যেন যমীন যা উৎপন্ন করে উহা থেকে তিনি কতক আমাদের জন্য উৎপন্ন করেন, যথা ঃ উহার শাক-সব্জী, উহার শস্য এবং উহার গম এবং উহার মুসুর এবং উহার পিঁয়াজ।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সঙ্গে বদল করতে চাও? চলে যাও কোন শহরে এবং তোমরা যা চেয়েছ তা সেখানে অবশ্যই রয়েছে। তখন আল্লাহ্তাআলা তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র অবধারিত করে দিলেন এবং তারা আল্লাহ্র গযবের পাত্র হ'ল, ইহা এজন্য হ'ল যে, তারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে চেষ্টা করত; ইহা এজন্য যে, তারা অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন করত।

আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ ঃ একদিন হযরত মূসা (আঃ) তূরপর্বতে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য গিয়েছিলেন। তখন হযরত মূসা (আঃ) বললেন, হে আমার জাতি! আমি তূর পর্বতে গিয়ে আল্লাহ্র সঙ্গে ত্রিশ রাত্রি অবস্থান করব। তার ভাই হারূনকে বললেন, তুমি আমার অনুপস্থিতিতে আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদের সংশোধন করবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।

অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) তূর পর্বতে চলে গেলেন, সেখানে ত্রিশ রাত্রি অবস্থান করবার পর আল্লাহ্ আরও দশ রাত্রি দ্বারা চল্লিশ রাত্রিপূর্ণ করেছিলেন।

যখন হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে আসলেন এবং তার প্রভু তার সাথে ব্যাক্যালাপ করলেন। তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে দর্শন দাও যেন আমি তোমার দিকে তাকাতে পারি।

আল্লাহ্ বললেন, তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পারবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও। অতএব যদি ইহা স্বস্থানে স্থির থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখবে। এবং যখন তার প্রভু ঐ পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতির্বিকাশ করলেন, তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন এবং মূসা (আঃ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। যখন তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেলেন, তখন তিনি বললেন, তুমি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র, আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি এবং আমি মু'মিনগণের মধ্যে প্রথম।

আল্লাহ্ বললেন, হে মূসা! নিশ্চয় আমি আমার পয়গাম দ্বারা এবং কালাম দ্বারা (সমসাময়িক) সকল মানবের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম, অতএব দৃঢ়ভাবে ধারণ কর যা আমি তোমাকে দান করছি এবং কৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হও। এবং আল্লাহ্ তার জন্য কতক ফলকের উপর প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং সব কিছুর ব্যাখ্যা লিখে দিলেন। এবং বললেন, উহাদিগকে শক্ত করে ধরে রাখ এবং তোমার জাতিকে আদেশ কর যেন তারা উহার উৎকৃষ্ট বিষয়াবলীকে শক্ত করে ধরে রেখে অচিরেই আমি তোমাদিগকে দুষ্কৃতিপরায়ণদের আবাসস্থল দেখাব।

এদিকে হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতি তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা তৈরী করল একটি গোবৎস একটি প্রাণহীন দেহ যার মধ্যে থেকে হাম্বা রব বের হ'ত। তারা তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল এবং তারা ছিল যালেম।

আল্লাহ্ বললেন, হে মূসা! তোমাকে কিসে তোমার জাতি থেকে চলে আসার জন্য তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করেছিল?

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, তারা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করছে এবং হে আমার প্রভু! আমি এজন্য তোমার নিকট তাড়াতাড়ি এসেছি যেন তুমি সন্তুষ্ট হও। আল্লাহ্ বললেন, আমরা নিশ্চয় তোমার কওমকে তোমার আসার পর এক পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামেরী তাকে পথ ভ্রষ্ট করেছে।

তখন হযরত মূসা (আঃ) ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ অবস্থায় তার জাতির নিকট ফিরলেন, এবং বললেন, হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সাথে এক উত্তম ওয়াদা করেন নি? সেই অঙ্গীকার পূর্ণ হবার সময় কি তোমাদের জন্য অতি দীর্ঘ হয়েছিল? অথবা তোমরা কি ইচ্ছা করছো যে, তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক যার কারণে তোমরা আমার সাথে ওয়াদা করছো?

তারা বলল, আমরা তোমার সাথে ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নি, বরং আমাদের উপর সে ফেরাউনের জাতির মণি-মুক্তা-খচিত স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকারাদির যে বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল আমরা উহা ফেলে দিয়েছি এবং তদনুরূপ সামেরীও উহা ফেলে দিয়েছে। তৎপর সে তাদের জন্য একটি গোবৎস প্রস্তুত করল, যা কেবল একটি দেহ ছিল, যার মধ্যে থেকে এক নিরর্থক হাম্বা রব বের হত। এরপর সামেরী এবং তার সাথীগণ বলল, ইহা তোমাদেরও মা'বূদ এবং মূসারও মা'বূদ, কিন্তু মূসা ইহা ভুলে পিছনে ফেলে গেছে।

অথচ হারূন হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তাদিগকে বলেছিলেন, হে আমার জাতি! এর দ্বারা নিশ্চয় তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ পালন কর।

তারা বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত না মূসা আমাদের নিকট ফিরে আসবে আমরা এর ইবাদতে মশগুল থাকতে আদৌ নিবৃত্ত হব না।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে যা প্রতিনিধিত্ব করছো উহা কতই না মন্দ! তোমরা কি তোমাদের প্রভুর আদেশের অপেক্ষা না করে পথ উদ্ভাবনের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করছো? হে আমার জাতি! তোমরা গো-বৎসকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করে নিশ্চয় নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করছো। তোমরা কি ইহা দেখ নি যে, ইহা তোমাদের সাথে কথা বলে না এবং তোমাদিগকে কোন পথে পরিচালিতও করে না?

অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর, এবং তোমরা তোমাদের আত্মার কুপ্রবৃত্তিসমূহকে হত্যা কর, তোমাদের সৃষ্টিকর্তার সমক্ষে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে, নচেৎ তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হবে, এবং যার উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হয়, সে নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এবং তিনি ফলকগুলি ভূমিতে রেখে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথা ধরে নিজের দিকে টেনে আনলেন। এবং বললেন, হে হারূন, যখন তুমি তাদিগকে বিপথগামী হ'তে দেখছিলে তখন কে তোমাকে বাধা দিয়েছিল আমার অনুসরণ করতে? তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করলে ?

হযরত হারূন (আঃ) বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র! তুমি আমার দাড়ি ও আমার মাথার চুল ধরনা। আমি এ আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তুমি বিভেদ সৃষ্টি করছো এবং তুমি আমার কথার অপেক্ষা কর নি। হে আমার মায়ের পুত্র! নিশ্চয় এ জাতি আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। সুতরাং তুমি আমাকে শত্রুদের নিকট হাস্যাস্পদ কর না এবং আমাকে অত্যাচারী জাতির অন্তর্ভুক্ত কর না। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, সামেরী! তোমার ব্যাপার কি? সামেরী বলল, আমি যা কিছু অবলোকন করেছিলাম তা তারা অবলোকন করে নি। অতএব আমি এ রসূলের (তোমার) শিক্ষার কতকাংশ গ্রহণ করেছিলাম। অতঃপর আমি ইহাও সুযোগ মত ফেলে দিয়েছিলাম। এবং আমার অন্তর আমাকে ইহা সুশোভিত করে দেখিয়েছিল। তখন হযরত মূসা (আঃ) বললেন, দূর হও! এখন তোমার জন্য ইহাই অবধারিত করা হল যে, তুমি আজীবন প্রত্যেককে এ কথা বলতে থাক, আমাকে স্পর্শ কর না এবং তোমার জন্য শাস্তির এক সময় নির্ধারিত আছে যা তুমি কখনও টলাতে পারবে না। এমন তুমি তোমার মা'বূদের দিকে লক্ষ্য কর, যার সম্মুখে বসে তুমি উহার ইবাদত মশগুল থাকতে। আমরা নিশ্চয় ইহাকে পোড়াবো। অতঃপর উহার ছাই সমুদ্রে যথেচ্ছাভাবে ছড়িয়ে দেব; তোমাদের মাবূদ তো কেবল আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই যিনি সকল বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন।

তারা বলল, 'হে মূসা! আমরা তোমার উপর আদৌ ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহ্‌কে সামনা-সামনি দেখব। ফলে আল্লাহ্ বজ্রপাত দ্বারা তাদিগকে আক্রমণ করলেন, এতে তারা নিজেদের আচরণের পরিণতি অবলোকন করেছিল। তখন তারা অনুতাপে নিজেদের হাত কচলাতে লাগল এবং দেখল যে, বস্তুতই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা বলল, যদি আমাদের প্রভু আমাদের উপর কৃপা না করেন এবং আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তাহলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উভয়কে তোমার রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট কর, কেননা তুমিই রহমত-কারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রহমকারী। হযরত মূসা (আঃ) তার জাতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, নিশ্চয় তারা গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে। অচিরেই তাদের উপর তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে বর্ষিত হবে ক্রোধ এবং এ জীবনে লাঞ্ছনা। এবং এভাবে আল্লাহ্ মিথ্যা রটনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়ে থাকেন। এবং যারা মন্দ কাজ করে এবং এরপর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয় তোমার প্রভুই এরপর অতীব ক্ষমাশীল, বারবার কৃপাকারী। তখন হযরত মুসা (আঃ)-এর ক্রোধ প্রশমিত হ'ল তিনি ফলকগুলিকে তুলে নিলেন যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে তাদের জন্য ফলকের লেখাগুলির মধ্যে হেদায়াত এবং রহমত ছিল।

হযরত মূসা (আঃ) নিজ জাতি থেকে সত্তর জন লোককে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত স্থানে এবং নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাতের জন্য বেছে নিলেন। যখন ভূমিকম্প তাদিগকে আঘাত হানল, তিনি বললেন, 'হে আমার প্রভু! যদি তুমি ইচ্ছা করতে তাহলে তুমি এর পূর্বেই তাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করে দিতে পারতে। আমাদের মধ্য থেকে নির্বোধরা যে কাজ করছে তার জন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করে দেবে? ইহা তোমার পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নয়; ইহা দ্বারা তুমি যাকে চাও পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত কর এবং যাকে চাও হেদায়াত দাও। তুমি আমাদের রক্ষক। অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর কৃপা কর, কেননা তুমি ক্ষমাকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম। এবং তুমি আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও। নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে অনুতাপের সাথে ফিরছি। তিনি বললেন, আমি যাকে চাই আমার আযাব দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে। (চলবে)

- মোঃ হেলাল উদ্দীন

রহস্যময় একটি কবর

সৃষ্টি লগ্ন হ'তে লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্ম আর মৃত্যুর হিসাব যেমন স্রষ্টা ব্যতিরেকে কারোই জানা নেই ঠিক তেমনইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আরো যে কত সংখ্যক মানুষ এ সুন্দর, সবুজ, সুজলা, সুফলা, শ্যামলে ঘেরা পৃথিবীতে আসবে আর যাবে উহার অগ্রিম হিসাবও কারোই পক্ষে প্রদান করা সম্ভব নয়। এই ধরণীতলে আগত লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে এমন একজন অসাধারণ মানুষ রয়েছেন যাঁর জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য নিয়ে হাজার হাজার পুঁথি-পুস্তক হয়েছে। যার অধিকাংশই আজগবি গল্প আর কিচ্ছা কাহিনীতে ভরা। তাঁর জন্ম, মৃত্যুর রহস্য নিয়ে এসব কল্প-কাহিনী আলোচনার প্রয়োজন মনে হয় শেষ হয়েছে। কারণ, সকল আলোচকবৃন্দের শ্রেষ্ঠ আলোচক মহান আল্লাহ্তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব আল্ কুরআনে অতি নিখুঁতভাবে হযরত ঈসা মসীহ্ নাসেরী (আঃ)-এর বিনা পিতায় জন্ম মৃত্যুর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাই সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট রহস্যের আবর্তনে আবর্তিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবরের রহস্য উন্মোচিত করার লক্ষ্যেই আজকের শিরনাম "রহস্যময় একটি কবর"। পবিত্র কুরআন করীম হ'তে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ)। হযরত ইমরানের ঔরসে হযরত ইউহান্নার ওয়াকফকৃত সন্তান বায়তুল মোকাদ্দসের সেবিকা সতী-সাধ্বী কুমারী কন্যা হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা (আঃ)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল বেথেলহেম এলাকার খেজুর পাকার মৌসুমে একটি ফলবান খেজুর বৃক্ষের ছায়াতে। জন্মের পূর্ব হতেই তাঁর মাতার উপর ইহুদী সমাজের পন্ডিত পুরোহিতদের পক্ষ হ'তে অমানুসিক নির্যাতন চালানো হয়। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পর তাদের নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে যায়, এমতাবস্থায় পন্ডিত পুরোহিত ও সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়েই তিনি যৌবনে উপনীত হন। এ পর্যায়ে এসে স্রষ্টার হুকুমে তিনি নিজেকে মসীহ বা বনী ইস্রাঈল জাতির ত্রাণকর্তা হিসাবে ঘোষণা প্রদান করেন। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার আর নির্যাতনের মাত্রা এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে, এক পর্যায়ে তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় হাতে পায়ে লোহার বড় বড় পেরেক ঠুকিয়ে ক্রুশে লটকানো হয়। যন্ত্রণার জ্বালা সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে তিনি বলে ওঠলেন ঃ 'এ্যালি এ্যালি লেমা সাবাকতানি"- প্রভু হে আমার! তুমি কেন আমায় এমনিভাবে পরিত্যাগ করলে। জুলমবাজ আর অত্যাচারী বকধার্মীকদের অত্যাচারে সর্বস্ব হারানোর দুঃখ বেদনা ব্যক্ত করতে যেয়ে হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, "পাখিরও বাসা আছে, শিয়ালেরও গর্ত আছে, কিন্তু মানুষ্যপুত্র মসীহ্র মাথা গোজার জায়গা নেই"। যা হোক এমতাবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর গর্ভধারিণী মা হযরত মরিয়মকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমান ফিলিস্তিনের ব্যাবিলন এলাকা হতে হিজরত করতে বাধ্য হন। এ হিজরত সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন করীমে বলা হয়েছে, ওয়া জায়ালনাবনা মারইয়ামা ওয়া উম্মাহু আয়াতাঁওয়াআওয়ায়নাহুমা ইলা রাবওয়াতিন যাতি ক্বারারিউঁ ওয়া মা'ঈনা" (মু'মিন ঃ ৫১) অর্থ ঃ "এবং মরিয়মের পুত্রকে এবং তার মাতাকে আমরা এক নিদর্শন করেছিলাম এবং আমরা তাদের উভয়কে (সবুজ-শ্যামল) উপত্যকার এক উচ্চভূমিতে আশ্রয় প্রদান করেছিলাম যা বসবাসের জন্য যোগ্য এবং ঝরণাবিশিষ্ট ছিল"। খৃষ্টান গবেষকগণের তথ্যানুযায়ী ফিলিস্তিনের পূর্বদিকে ও মৃত সাগরের উত্তর দিকে কামরান উপত্যকায় সুদীর্ঘ ১২ বছর যাবত পাহাড় খনন করে সেস্থানের দশটি গহ্বর হতে নাসরতীয় মসীহ্ (আঃ)-এর দ্বারা লিখিত মৃৎপাত্রে রক্ষিত হিব্রুভাষায় কতকগুলো গীতিকা পাওয়া যায়। এসব গীতিকা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হতে জগদ্বাসীর গোচরে আসা আরম্ভ করেছে। এসব গীতিকার কেবল মাত্র একটি গহবরে প্রাপ্ত বিষয়াদি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে লিখা আছে-

শত্রুরা আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্তাআলা আমাকে মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা করলেন, এবং কবর তথা পর্বত গুহা হতে বের করে আনলেন। এরপর আমি বহু স্থানে ভ্রমণ করলাম ইত্যাদি। (Sea also `The Reddle of the Scrolls' by H. E Del. Medico). রুশ পর্যটক নিকোলাস নটোভিচ, যিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দূরপ্রাচ্য পরিভ্রমণে এসেছিলেন, তাঁর রচিত "ঈসার অজানা জীবন" (দি আননোন লাইফ অব জিসাস) গ্রন্থে লিখেছেন যে, "হযরত ঈসা (আঃ) কাশ্মীরে এবং আফগানিস্থানে এসেছিলেন"। নিকোলাস নটোভিচ যখন কাশ্মীর পরিভ্রমণে আসেন সে সময়ে কাশ্মীরের মহারাজার কোর্টে কার্যরত বৃটিশ নাগরিক স্যার ফানসিস ইয়ং হাসব্যন্ড এর সঙ্গে জর্জিলা গিরিপথের নিকট তার দেখা হয়। হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রাচ্য ভ্রমণ সম্পর্কে আধুনিক গবেষণা নটোভিচ প্রণীত পুস্তকের জোরালো সমর্থন দান করে। অধ্যাপক নিকোলাস রোয়েরিক স্বরচিত "হার্ট অব এশিয়া" পুস্তকে লিখেছেন, '"খৃষ্টের সেই স্থানে আগমনের কৌতুহলপূর্ণ লোক কাহিনীর সম্মুখীন হ'লাম আমরা সর্ব প্রথম "শ্রীনগরে" এসে। অতঃপর আমরা দেখতে পেলাম কীরূপে ব্যাপকভাবে ভারতের লাদ্দাখ এবং মধ্য এশিয়ার অঞ্চলগুলোতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের গল্প কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। মধ্য এশিয়ার সর্বত্র, কাশ্মীর, লাদ্দাখ, তিব্বত এবং আরো উত্তরাঞ্চলে এই দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমান যে, হযরত ঈসা (আঃ) এই সকল অঞ্চলে আগমন করেছিলেন (গ্লিমপস্ অব ওয়ার্লড হিষ্টরী, বাই পন্ডিত জওহারলাল নেহেরু)। মিশরের বিখ্যাত কুরআন গবেষক রশীদ রেজা বলেছেন, "ঈসা (আঃ)-এর ভারতে আগমন এবং কাশ্মীরের শ্রনগরে মৃত্যুবরণ অসম্ভব কিছু নয়" (আল কুরআনুল হাকিম, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩, ৭২ পৃষ্ঠা)।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতার কবরও পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি হতে মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে কোহমারী পাহাড়ের পিন্ডি পয়েন্টে অবস্থিত। ঐ কবরের নিকট ছোট একটি প্রস্তর ফলকে লিখিত রয়েছে "জিয়ারত বিবি মরিয়ম"। এবং তাঁরই নামে ঐ পাহাড়ের নাম হয়েছে 'কোহমারী'। (Mystries of kashmir, by Mohammad Lashin, P-27-28) Heart of Asia নামক গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায়

উল্লেখ করা হয়েছে, কাশ্মীরের নিকটবর্তী কাশগড় হ'তে ছয় মাইল দূরে যিশুর মাতা মরিয়মের সমাধি বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ হ'তে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভারত উপমহাদেশে হিজরতের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর একটি হাদীস হ'তে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ ৮৭টি বছর ভারতের বিভিন্ন এলাকায় তৌহীদ প্রচারে রত থাকার পর মৃত্যুবরণ করেছেন (কাঞ্জুল উম্মাল)।

ভারতের কাশ্মীরে শ্রীনগর মহল্লায় একটি কবর রয়েছে, যা রওজাবল নামে পরিচিত। এই স্মৃতি সৌধ "ইউস আসফ" এর কবর, নবী সাহেবের কবর, সাহেবযাদা নবীর কবর এমনকি ঈসা সাহেবের কবর হিসাবে প্রচারিত হয়ে আসছে। ঐতিহাসিক তথ্য মোতাবেক কবরটি ১৯০০ বছরের অধিক পূর্বে নির্মিত। এই কবরটিতেই হযরত ঈসা মসীহ্ নাসেরী (আঃ) চির নিদ্রায় শায়িত। সর্বপ্রথম জগদ্বাসীর সামনে এই কথাটি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর রচিত "মসীহ্ হিন্দুস্থানমেঁ" পুস্তকে প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে একজন বনী ইস্রাঈলী আলেম সালমান ইউসুফ তাজের বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর নিকট আমি একটি ছবি দেখেছি উহা নিশ্চিত বনী ইস্রাইলীগণের কবরের ন্যায়, এবং উহা কোন বনী ইস্রাইলী মহাপুরুষের কবর এবং অদ্য ইংরাজী ১৮৯১ সালের ১১ই জুন তারিখে এ ছবি দেখার সময় এই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করলাম- সোলমান ইউসুফ তাজের। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আরবী পুস্তক 'আল্ হুদা'তে সর্বপ্রথম ঘোষণা প্রদান করা হয়, "যদি যীশুর কবরকে খনন করা হয় তবে উহা হতে বহু অজানা রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে" (পৃষ্ঠা ১১৭)।

বেশ কিছুকাল পূর্বে জনৈক স্পেনিশ খৃষ্টান দার্শনিক, পন্ডিত ফিগার কাউজার তাঁর 'জিসাস ডেড ইন কাশ্মীর' নামক পুস্তকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবর নামে পরিচিত ঐ কবরটিকে খনন করে দেখার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। ১২ই মার্চ, ২০০২ইং ২৮শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৪০৮ বাংলা দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর (কবরের ছবি নীচে মোটা হরফে লিখা হয়েছে "কাশ্মীরের শ্রীনগরেই চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন যীশুখ্রীষ্ট?" শ্রীনগর থেকে এএফপিঃ একজন মার্কিন গবেষক ওসলন ধারণা করছেন তিনি যীশু খ্রীষ্টাব্দের চূড়ান্ত সমাধি খুঁজে পেয়েছেন। ভারত শাসিত কাশ্মীরের শ্রীনগরেই খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বলে তার বিশ্বাস।

গবেষক ওলসন বলছেন, কবরটি খুঁড়ে দেহাবশেষের ডিএন এ টেষ্ট ও কার্বন ডেটিংয়ের মাধ্যমে তিনি এ নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটাতে চান। ওলসন ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের মারীতে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক আহমদ হাসান দানী ও সাইদা রহমানের তত্ত্বাবধানে একটি মাজার খনন করেছেন। যীশু খ্রীষ্টের মা মেরী (মরিয়ম) মারীতেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বলে মনে করা হয়।

তবে রওজাবলি মাজারের ব্যবস্থাপকরা সেখানকার সমাধি খুঁড়তে দিতে রাজী নন। তারা বলছেন এর ফলে মাজারের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হবে। এ বিষয়ে সাহায্য চেয়ে তাই গবেষক ওলসন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহ্র কাছে আবেদন করেছেন। ওলসন বলেছেন, একান্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানই তার গবেষণার উদ্দেশ্য এবং তিনি একজন সত্য সন্ধানী মাত্র।

'ওলসনের ধারণা, মোজেস বা মূসা নবীও উত্তর কাশ্মীরে সমাধিস্থ হয়েছেন। এছাড়া নবী হারুন শ্রীনগরের উপকণ্ঠ হারোয়ানে এবং সুলায়মান বা সোলায়মান চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন শ্রী নগরের তখত-ই-সুলায়মানে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করা আবেদনে তিনি বলেন; "এমনকি মিশর বা ইসরাঈলের চেয়েও আপনাদের এখানে খ্রীষ্টান ধর্মের পবিত্র স্থানের সংখ্যা বেশী।" ওলসন বলেছেন,"সহিংসতা বিক্ষুব্ধ ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের এক তীর্থ কেন্দ্রে পরিণত করার জন্যই প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে চান তিনি।" ওলসনের দাবি অনুযায়ী এখনই হয়তবা কবরটি খনন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ এর জন্য তাঁর ন্যায় সত্য-সন্ধানীর সংখ্যা অতি বিরল। তবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবরটি একদিন অবশ্যই খনন করে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যের উদঘাটন করা হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ ওয়া ইযাল **কুবূরু বু'সিরাত** অর্থ ঃ এবং যখন কবরসমূহকে উৎপাটিত করা হবে। **'আলিমাত নাফসুম মা ক্বদ্দামাত ওয়া আখ্খারাত** অর্থ ঃ তখন প্রত্যেক আত্মা জানতে পারবে যে, সে সামনে কি পাঠিয়েছে এবং পিছন কি ছেড়ে এসেছে (সূরাতুল ইনফিতার) হযরত ঈসা মসীহ নাসেরী (আঃ)-এর কবর বলে পরিচিত সমাধিটি অবশ্যই খনন করে প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত করা আবশ্যক। কারণ তাঁর কবরের অবস্থানের উপরেই ইসলাম ধর্মের জীবন নিহিত। যেমন সূরাতুস্ সাফ্ফ সপ্তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, **ওয়া মুবাশ্শিরাম বিরসূলিন ইয়াতী মিমবাদিস্মূহু আহমদ, ফালাম্মা জায়াহুম বিলবায়িনাতি ক্বালূ হাযা সিহরুম মুবীন** অর্থ ঃ এবং এমন এক রসূলের সুসংবাদ দিতে যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে 'আহমদ' অতঃপর যখন সে তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ আগমন করলো। তারা বললো ইহাতো প্রকাশ্য যাদু। অতএব ঈসা (আঃ)-এর কবর হিসাবে চিহ্নিত সমাধি একদিন অবশ্যই খনন করা হবে। আর ফলে যেসব প্রমাণাদি বেড় হবে, যার ফলে যীশু বিষয়ে সকল জলপনা-কল্পনার অবসান এবং পৌলীয় খ্রষ্টান ধর্মের কবর রচিত হবে। আর ইসলাম তার নতুন জীবনে দ্রুত যৌবন প্রাপ্ত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

-মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম

বিশেষ দ্রষ্টব্য

লেখক তৈরী করার উদ্দেশ্যে এবং কাঁচা লেখকদের হাত পাকা করার জন্যে নতুনদের পাতা খোলা হয়েছে অনেক আগেই। নতুনদের লেখার মধ্যে মসলা-মাসায়েল প্রভৃতি বিষয়ে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে এবং অনবধানবশতঃ তা ছাপাও হয়ে যেতে পারে। এগুলোকে অথরিটি হিসেবে গণ্য করার অবকাশ নেই। এমন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠকদের চোখে পড়লে তা আমাদের দৃষ্টি গোচর করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি।

- নির্বাহী সম্পাদক

পার্থিব জীবন ভোগ্য-সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন, "তোমরা মনে রেখ, এ পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাকচিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র। এর দৃষ্টান্ত বারিধারার ন্যায় যার (দ্বারা উৎপাদিত) শাক-সব্জী কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা পরিপক্ক হয় এবং তুমি তাকে হলুদবর্ণ দেখতে পাও, যা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। পরকালে রয়েছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব এবং (সৎকর্মশীল লোকদের জন্য) আল্লাহ্‌র নিকট হ'তে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) ছলনাময়ী ভোগের সামগ্রী ব্যতিরেকে কিছু নয়" (৫৭ঃ২১)।

আরেক স্থানে মহান খোদাতআলা বলছেন, "কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছ। অথচ পরকালই অধিকতর উত্তম ও স্থায়ী" (৮৭ঃ১৭-১৮)।

আবার খোদাতাআলা বলছেন, "মানুষের নিকট কামনার বস্তুগুলির যথা রমণীগণের, সন্তান-সন্ততির, স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বরাজির গৃহপালিত পশুসমূহের এবং শস্যক্ষেত্রের প্রতি আসক্তিকে মনোরম করে দেখান হয়েছে। এগুলি সব পার্থিব জীবনের ভোগের সামগ্রী, কিন্তু আল্লাহ্ তিনি, যাঁর নিকট উত্তম আবাসস্থল রয়েছে" (৩ঃ১৫)।

পবিত্র কুরআন পাঠে আমরা জানতে পারলাম যে, পার্থিব জীবনের কোন দাম নেই খোদার নিকট। পার্থিব জীবনে যা কিছু করি আমরা তা সাময়িক। আসুন এখন রসূল (সঃ)-এর কথা থেকে পার্থিব জীবনের আলোচনা শুনি ঃ হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর খেদমতে এসে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যা করলে আল্লাহ্ আমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষেরাও আমাকে ভালবাসবে।" তিনি (সঃ) বললেন, 'দুনিয়া ত্যাগ কর, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন। এবং মানুষের নিকট যা আছে, তার প্রতি লালসা করো না তবে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে" (মিশকাত, কিতাবুর রিকাক, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

হযরত মুসতারিদ ইবনে সাদ্দাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, পরকালের তুলনায় ইহকালের জীবন সেরূপ, যদি তোমাদের ভিতর কেউ সমুদ্রের পানিতে তার আঙ্গুল চুবিয়ে তুলে দেখে যে, তাতে কতটুকু পানির কণা লেগে আছে (মিশকাত, কিতাবুর রিকাক, মুসলিম)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "একজন মু'মিনের জন্য ইহকাল কয়েদখানা ও অবিশ্বাসীর জন্য জান্নাত" (মিশকাত, কিতাবুর রিকাক, মুসলিম)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "সে ব্যক্তিই সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযক দান করা হ'ল এবং আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন এবং তাকে সন্তুষ্ট রেখেছেন" (মিশকাত, কিতাবুর রিকাক, মুসলিম)।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি (যে পরিমাণ) দুনিয়াকে ভালবাসে সে (সেই পরিমাণ) তার আখেরাতকে মহব্বত করে, সে সেই পরিমাণ দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। সুতরাং যা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে তার উপর তাকে প্রাধান্য দাও যা চিরস্থায়ী থাকবে" (মিশকাত, কিতাবুর রিকাক, আহমদ ও বায়হাকী)। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "দিনারের দামের উপর লা'নত এবং দিরহামের দামের উপর লানত" (মিশকাত, কিতাবুর রিকাক, তিরমিযী)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর যার (আখেরাতে) কোন ধন-সম্পদ নেই। আর দুনিয়ার জন্য সেই ব্যক্তিই সঞ্চয় করে যার কোন আকল বা বুদ্ধি নেই" (আহমদ, বায়হাকী)। এ ছিল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাণী যা পার্থিব জীবন সম্পর্কে বলে গেছেন।

এখন যুগ-ইমামের বাণী শুনি, তিনি কি বলেন এই বিষয়ে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেনঃ "মৃত্যুর পর পরই মানুষ নিজেকে পর জগতে দেখতে পায়। এ সময় যে লোক পার্থিব জীবনের সম্পদ অর্জনের জন্য তার জীবনটাই নষ্ট করেছে এবং খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কোন চেষ্টা করে নি, সে মৃত্যুকে একটি তিক্ত পেয়ালারূপে দেখতে পায় এবং সে দুঃখ ও বেদনা নিয়ে এ জগৎ ত্যাগ করে। তার শাস্তির এটাই শুরু। কেননা সে পর জগতের জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করে নি। অতএব এটা জরুরী যে, মানুষের অন্তরে যেন দুনিয়ার প্রতি কোন ভালবাসা না থাকে কেননা, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পরকালের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করে" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা, রিভিউ অব রিলিজিয়নস্ ১৯০৫, ৬ষ্ঠ খন্ড)।

পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী শ্রবণ করে এখন নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে, কতটুকু পার্থিব জীবনের মায়ার বাঁধনে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি। আমরা যদি নিজেকে প্রকৃত মুসলমান বলে স্বীকার করতে চাই তা হলে অবশ্যই কুরআন, হাদীস এবং যুগ-ইমামের কথার উপর পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। তারপরেই না আমরা নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলমান বলে পরিচিত হতে পারি।

যেখানে আল্লাহ্‌তাআলা নিজে বলেছেন, "রমণীগণ, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ (কোন কিছুই কাজে লাগবে না পরকালে) এ সব কিছু কেবল মাত্র পার্থিব জীবনের ভোগ্য-সামগ্রী"। সেখানে আমাদের চিন্তা করা দরকার, এই দুনিয়ার কোন কিছুই আমাদের জন্য সামান্য উপকারে আসবে না কেবলমাত্র উত্তম চরিত্র গঠন করতে পারলে পরকালে তার জন্য প্রতিদান পাওয়া যাবে, উত্তম চরিত্র বলতে কুরআন, হাদীস এর আলোতে জীবন সাজাতে হবে।

তাই আসুন আমরা পার্থিব জীবনের মায়া-মমতা ত্যাগ করে, আল্লাহ্ এবং নবী রসূলের পথ অনুসরণ করি। যার ফলে আমরা পেতে পারি আল্লাহ্‌র করুণা ও আশীষ। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে পার্থিব জীবনের মায়া ত্যাগ করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

- মাহমুদ আহমদ সুমন
মোয়াল্লেম

প্রসঙ্গ ঃ কাদিয়ান

৮ই নভেম্বর, ২০০১ইং রোজ বৃহস্পতিবার আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন। এই দিন আল্লাহ্‌র একান্ত ফযলে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ানে প্রসিদ্ধ স্থান যা ঐশী নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত বেহেশ্‌তি মকবেরায় এ যুগের ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর রওজা মোবারকে (কবরে) বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাঙ্ক্ষিত ও নির্দেশিত মহব্বতপূর্ণ সালাম "আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌ ওয়া বারাকাতুহু" আমি পৌছে দিয়েছি, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

হাদীস শরীফের আলোকে জানা যায় যে, এ পৃথিবীতে কেবল মাত্র দু'জন ব্যক্তিকে নবীজি (সঃ) নিজ পক্ষ থেকে সালাম পৌছাবার জন্য তার উম্মতকে আদেশ দিয়েছেন। একজন হলেন হযরত ওয়ায়েয করনী (রাঃ) এবং অপর জন হলেন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল শরীফে বর্ণিত আছে হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "ম্যায় উমীদ রাখতা হো কেহ্‌ আগার মেরী উমর লাম্বী হুয়ীতো ম্যাঁয় ঈসাবনে মারইয়াম ছে খোদ মিলুংগা আওর আগার মুঝে জালদী মওত আগায়ী তো তুম মেছে জো শাখ্‌সভী উসকো পায়ে উসে মেরী তরফছে সালাম পৌহ্‌চায়ে-(উর্দূ অনুবাদ)।" [রেওয়ায়াত আবূ হুরায়রা (রাঃ)]

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৮)

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অশ্রুপূর্ণ, আবেগআপ্লুত হৃদয়ে সর্বপ্রথম নবীজী (সঃ)-এর সালাম পৌছানোর পর আমার পক্ষ থেকে ও মৌলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবের পক্ষ থেকে সালাম পৌছালাম। তারপর আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান ও স্ত্রী পুত্রের দেয়া সালাম পৌছালাম। তাঁর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন দেয় নি এমন কোন পুরুষ বা নারী আমার চোখে পড়ে নি। তবে কাউকে শিরক করতে দেখে নি যা আজকাল পীর-দরবেশদের মাজারে গেলে চোখে পড়ে। যদিও ঐ সকল মাজারের দেয়ালে বড় অক্ষরে লেখা থাকে "মাজারে সিজদাহ্‌ করবেন না।"

পীর পূজা কবর পূজার মত শিরক বিদয়াত ও অবক্ষয়ে ভারাক্রান্ত অসহায় জর্জরিত দিক ভ্রম মুসলমান সহ অন্যান্য পথভ্রষ্ট ও কোপগ্রস্ত মানবকুলকে সত্যিকার খোদার পরিচয়, খোদা-প্রেম ও সঠিক পথের দিশা দেবার জন্য পুণ্যভূমি কাদিয়ানে যে জলসা করা হয় তা অতুলনীয়।

গত ৮, ৯ ও ১০ নভেম্বর, ২০০১ইং তিন দিন ব্যাপী প্রায় অর্ধ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে পূর্ব পাঞ্জাবের কাদিয়ানে এক ইসলামিক রূহানী জলসা দেখে অভিভূত না হয়ে পারলাম না। এত দেশী ভিন দেশী বিভিন্ন ভাষাভাষী নারী পুরুষের রুচিসম্মত খাবার তৈরী ও পরিবেশন রাত্রি যাপনের সুব্যবস্থা জলসার ওয়াজ শ্রবণের জন্য পৃথক পৃথক পেন্ডেলের ব্যবস্থা করা চাট্টিখানি কথা নয়। কাদিয়ানকে বলা হয় "দারুল আমান" অর্থাৎ নিরাপদ শহর। এ শহরে প্রবেশ করলে কেউ মুসাফির থাকে না। নামায কসর হয় না। বাস্তবেও তাই অনুভব করেছি। জলসার দিনগুলো ছাড়াও আপনি যে দেশ থেকেই আসুন না কেন আপনি মিনিষ্টার কিংবা বস্ত্রহীন দরিদ্র হোন না কেন সবার জন্য নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত। যেন আপনি নিজ দেশে নিজ গৃহে অবস্থান করছেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও খাদেমগণের অমায়িক ব্যবহার আপনাকে মুগ্ধ করবে। তাই আমি মনে করি, যে কেউ আহমদী হয়েছেন অথচ একবারও কাদিয়ান আসেন নি, তিনি তাঁর চক্ষুকে ও হৃদয়কে বঞ্চিত করছেন। আল্লাহ্‌তাআলা যখনই কাউকে তৌফীক ও সময় সুযোগ দিবে কাল বিলম্ব না করে কাদিয়ান ঘুরে আসার পরামর্শ রইল।

বাংলাদেশ হ'তে শুধু কাদিয়ান যাতায়াতে কম বেশি $ ১০০ মার্কিন ডলারই যথেষ্ট যাদের সাধ আছে সাধ্য কম তাদের জন্য। এর মধ্যে সুখের সংবাদ হ'ল আমার জানা মতে প্রতি বছর কাদিয়ানের জলসা উপলক্ষ্যে কোলকাতা হতে ১টি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে আমাদের প্রাণ-প্রিয় খলীফা সাহেবের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশ থেকে কোন রকমে কোলকাতার ২০৫টি পার্ক স্ট্রীট আহমদীয়া মসজিদের কমপ্লেক্সে পৌছুতে পারলে আপনি অতি সহজেই কাফেলার সাথে দূর পাল্লার ঐ স্পেশাল ট্রেনে চড়ে স্বপ্নের শহর কাদিয়ানে যেতে পারবেন। এ সুন্দর ব্যবস্থা গ্রহণে পশ্চিম বঙ্গের শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেবের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া প্রশংসার যোগ্য। কাদিয়ানে যেতে আমাকে আরেকটি বিষয় আকৃষ্ট করছিল তা'হল ঃ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর ব্যক্তিগত স্পর্শ করা স্থানগুলো দর্শন করা। কোথায় তিনি বসতেন, কোথায় বসে তিনি ইবাদতে মগ্ন হতেন, কোথায় বসে তিনি এত এত কিতাব রচনা করতেন, কোন্‌ মসজিদে নামায পড়তে যেতেন ইত্যাদি নানা বিষয়।

মসজিদে মোবারক, দালানে আম্মাজান ও মসজিদে আকসাতে প্রবেশ করলে পরে ঐসব ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলো চোখে পড়ে। বিশেষ বিশেষ স্থানগুলো এবং প্রেক্ষাপট সাইনবোর্ডে উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় লিখে রাখা হয়েছে। মসজিদে মোবারকে ইলহামে নবুওয়ত, ইলহামে খেলাফত ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর প্রবেশদ্বার চিহ্নিত করা আছে। লাল কালির ছিটা সম্পর্কিত ইতিহাস ও ঐ হুজরা বায়তুয্‌ যিকির, বায়তুল ফিক্‌র (বারাহীনে আহমদীয়া লেখার ছোট কামরা) বায়তুল হামদ, দালানে আম্মাজান, বায়তুদ্‌ দোয়ার প্রেক্ষাপট শ্বেত পাথরের ওপর কালকালি দিয়ে লিখা আছে। দালানে আম্মাজানে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর ব্যবহার্য কিছু আসবাবপত্র আছে। এর একটি কামড়ায় মির্যায়ী বংশের সৌভাগ্যশালী উত্তরাধিকারী সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহেবযাদা মিয়াঁ ওয়াসিম আহমদ সাহেব [হুযুর (আইঃ)-এর বড় ভাই]-এর বাসা। আগ্রহী মেহমানগণ এ কামড়ায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন। খাকসারেরও ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। ১৯৬৩ইং ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া টাংকের পাড় ৪৭তম সালানা জলসায় দু'জন সৌভাগ্যশালী শহীদের মধ্যে তারুয়ার আব্দুর রহীম সাহেব আমার নানা হন তা গর্বের সাথে উল্লেখ করে নিজ পরিচয় নিবেদন করলাম। তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আহমদীয়তের গোড়া পত্তনকারী সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ (রাঃ) সাহেবের পরিবারের কথাও জানতে চেয়েছেন। হযরত মির্যা গোলাম মর্তুজা সাহেবের খায়েশে নির্মিত মসজিদুল আকসাতে ঐতিহাসিক খুৎবায়ে ইলহামীয়া প্রদানের স্থানটি চিহ্নিত আছে। তারই পার্শ্বে শ্বেত পাথরে নির্মিত হাদীসে বর্ণিত সুউচ্চ মিনারাতুল মসীহ্‌ পৃথিবীর সর্ব ধর্মের মানুষকে যেন হাত ছানি দিয়ে আহ্বান করছে ঃ "জায়াল মসীহ্‌ জায়াল মসীহ্‌"। ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরদিন ২৭শে মে, ১৯০৮ সালে বিখ্যাত হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী "সুম্মা তাকুনূ খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওয়াত" (অতঃপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে)"। অনুযায়ী যে খেলাফত

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঐ স্থানটিতে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

বেহেশতি মাকবেরার গেট দিয়ে প্রবেশের পর হাতের ডান দিকের রাস্তা দিয়ে গেলে একটি স্থান দেখা যায়। সেখানেই ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মর দেহে কাফন পড়িয়ে রেখে সর্ব প্রথম খলীফা নির্বাচন করা হয় এবং প্রথম সৌভাগ্যশালী খলীফা আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে মু'মিনগণের ভোটে একমাত্র নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব হলেন আল্‌হাজ্জ হেকিম হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন (রাঃ)। এরপর থেকে আল্লাহ্‌তাআলার ইচ্ছায় ক্রমান্বয়ে বর্তমানে ৪র্থ খেলাফতের যুগ চলছে। আমাদের বর্তমান প্রাণ প্রিয় আমীরুল মু'মিনীন হলেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ আইয়াদাহুল্লাহুতাআলা বেনাসরিহিল আযীয।

পবিত্র কুরআন মজীদের একটি নির্দেশ হ'ল ঃ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল" (সূরাতুল আনআম ঃ ১২ আয়াত)

দীর্ঘদিন ধরে আমার মধ্যে এ খায়েশ ঘুরপাঁক খাচ্ছিল। কাদিয়ান সফরের মধ্য দিয়ে এ খায়েশের কিছু হলেও পূরণ হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীনতম রেল স্টেশন শিয়ালদহ থেকে কাদিয়ান যাবার পথে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান দেখেছি। কাশি-বেনারস জলন্ধর, অমৃতসর, শিখদের স্বর্ণ মন্দির, নয়া দিল্লীতে তোঘলকাবাদের ধ্বংসস্তুপ ঐতিহাসিক দিল্লীর বিখ্যাত জামে মসজিদ, লাল কেল্লা কুতুব মিনার কলকাতায় হাওড়া ব্রিজ ও পাতাল রেলে চড়ে, রানী ভিক্টোরিয়া পার্ক, প্রাচীনতম খ্রীষ্টান গীর্জা এবং বিখ্যাত যাদুঘর, আগ্রাতে মোগল বাদশাদের স্মৃতি চিহ্ন বিজরিত আগ্রাফোর্ট, বাদশাহ্ শাহজাহান ও তার অর্ধাঙ্গিণী মমতাজ বেগমের ভালবাসার নিদর্শন বহনকারী তাজমহল, বাদশা আকবর, সেলিম ও তার পীরের মাজার, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন ইত্যাদি দেখে উপলব্ধি হয় আহমদী মুসলিম জামাত কোন পথে আর অন্যান্যরা কী করছে। দিকভ্রম এ সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন পথে। প্রাণহীন এসব স্মৃতি চিহ্নগুলো যেন ইঙ্গিত করছে ঃ হে মানুষেরা তোমরা যাও ঐ মিনারাতুল মসীহের দিকে যার শুভ্রতা দিনরাত তোমাদের আহ্বান করছে – জায়াল মসীহ্ জায়াল মসীহ্ (মসীহ আসিয়াছেন মসীহ্ আসিয়াছেন) এর যুগের মসীহ্ কেবল দেখাতে পারে সিরাতুল মুস্তাকীম।

- শাহ আলম খান
মোয়াল্লেম

সংবাদ

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবসের কর্মসূচী পালিত

দেরীতে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে আরও যারা শান-শওকতের সাথে মহান মসীহে মাওউদ (আঃ) দিবসের কর্মসূচী পালন করেছেন তারা হলেন ঃ সুন্দরবন, ময়মনসিংহ, বগুড়া, ঘাটুরা, চান্দপুর চা বাগান, মাহিগঞ্জ, তেজগাঁ, আশুলিয়া, হালকা (ঢাকা জামাত), আহমদনগর, নাটাই, সিলেট, খুলনা , বীরগাঁও ও কুমিল্লা জামাত।

- আহমদী বার্তা

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মিরপুরের উদ্যোগে ক্যান্সার ফান্ডে অর্থ জমা প্রসঙ্গে।

ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য একুশে টিভি ও দৈনিক প্রথম আলোর উদ্যোগে সোনালী ব্যাংকে একটি একাউন্ট খোলা হয়, যার নাম দেয়া হয় 'ক্যান্সার ফান্ড'। গত ১১-০৩-২০০২ তারিখে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার, মীরপুর-এর খেদমতে খালক বিভাগের উদ্যোগে সোনালী ব্যাংক মিরপুর-১ শাখায় ক্যান্সার ফান্ডে ১৬০০ (এক হাজার ছয় শ') টাকা জমা দেয়া হয়েছে। যারা ক্যান্সার ফান্ডে অর্থ দান এবং সময় দিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে আল্লাহ্ যাজায়ে খায়ের দান করুন।

- মীর ওয়াজেদ আলী
নাযেম খেদমতে খালক

জামালপুর জোনের ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২১ ও ২২শে মার্চ ২০০২ইং দু'দিনব্যাপী জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল মিলে জোনালভাবে প্রথম বার্ষিক ইজতেমা খোদার ফযল ও করমে সুন্দরভাবে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ছোনটিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত জামাতের সবাই হৃদ্যতার সাথে ইজতেমায় সহযোগিতা করেছেন।

- মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন, মোয়াল্লেম

কৃতী সন্তান-সন্ততি

অত্র জামাতের কানেতা আহমদ পিতা- শেখ বশীর আহমদ, মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া. এ বৎসর স্থানীয় মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় গ্রেডে প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করেছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

সে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার শেখ আব্দুল আলীর পৌত্রী এবং মগবাজার (ঢাকা) নিবাসী মরহুম মতিয়ার রহমান সাহেবের দৌহিত্রী। মেয়েটি জামাতী কর্মকান্ডেও বেশ উৎসাহী এবং পুরস্কারপ্রাপ্তগণের মধ্যে অন্যতমা। তার ভবিষ্যৎ Education Carrier উন্নতমানের হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

- এস কে আব্দুল আলী, সেক্রেটারী ওসীয়ত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বি. বাড়ীয়া

বিশেষ দোয়ার অনুরোধ

আমার প্রথমা কন্যা মমতাজ বেগম (সাথী) M.B.B.S (এম.বি.বি.এস) কোর্সে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল-এ ভর্তি হয়েছে আর দ্বিতীয় কন্যা কোহিনুর বেগম (বীতি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ১ম বর্ষ (সম্মান) এ ভর্তি হয়েছে।

তারা যেন ডাক্তারী ও অর্থনীতিতে সফলতার সাথে কৃতকার্য হ'তে পারে এবং জামাতের উত্তম সেবিকা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তার জন্য জামাতের সকল ভাই-বোনের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

- আব্দুল কাদির
ফতুল্লা হালকা (ঢাকা জামাত)

শোক সংবাদ

বিগত ০২-০৪-২০০২ইং তারিখ রোজ মঙ্গলবার ভোর ৫.০০ ঘটিকায় আমার শ্রদ্ধেয় 'মা' আমেনা খাতুন ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি এক ছেলে, তিন মেয়ে ও নাতী নাত্‌নী রেখে গেছেন। তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর খেদমতে দোয়ার আবেদন করছি।

- দৌলত আহমদ, শ্যামপুর, রংপুর

আহমদনগর জামাতের ২০তম সালানা জলসা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্‌তআলার খাস ফযলে গত ১২ ও ১৩ এপ্রিল রোজ শুক্র ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত আহমদনগর এর ২০তম সালানা জলসা আহমদনগর জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় (আলহামদুলিল্লাহ্‌)।

এই জলসায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের কেন্দ্র থেকে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, সেক্রেটারী উমুরেআমা জনাব এ, কে রেজাউল করীম, সেক্রেটারী ফাইন্যান্স জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদ, সেক্রেটারী তালীম ও তরবিয়ত জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, সেক্রেটারী জায়েদাদ জনাব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্‌,মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ মৌঃ হাফেজ সেকান্দর আলী, মোয়াল্লেম। ন্যাশনাল অডিটর জনাব আবুল খায়ের জনাব ইব্রায়েতুল হাসান যোগদান করেন।

বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (লাজনা ইমাইল্লাহ্‌) শুক্রবার সকাল ৯.০০টা হতে ১২.০০টা পর্যন্ত। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব শরীফ আহমদ, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব নাসিমা বশীর, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ আহমদনগর, 'নবীজী (সঃ)-এর শান' বাংলা নযমটি পেশ করেন জনাবা কুররাতুল এ্যান, 'আহমদী মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন

মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌।

জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ মহিলাদের কুরবানীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। লাজনাদের উদ্দেশ্যে নসীহত-মূলক বক্তব্য প্রদান করে আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর আমহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। দোয়ার মাধ্যমে এ অধিবেশন শেষ হয়। দুপুরের খাবার ও জুমআর নামাযের পর বিকাল ৩.০০টা-৬.০০টা উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌। দুররে সামীন হতে উর্দূ নযম পাঠ করে শুনান জনাব এস, এম, আব্দুল হক, মোয়াল্লেম। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করে আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর সাহেব। ভাষণ শেষে ন্যাশনাল আমীর সাহেব উদ্বোধনী দোয়া করান। 'কবুলিয়াতে দোয়া ও জীবন্ত খোদার পরিচয়' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ মুরব্বী সিলসিলাহ্‌। বাংলা নযম পাঠ করে শুনান জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। 'ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন হাফেয সেকান্দর আলী মোয়াল্লেম, 'খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা বশিরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ এবং নযম পাঠ করে শুনান জনাব পানাউল্লাহ্‌ মীরপুরী। এম. টি.এ হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা হয় ৬.০০টা হতে ৭.০০টা পর্যন্ত। নামায মাগরিব ও এশার পর প্রথম প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জামাত থেকে আগত নও মোবাইন ও জেরে তবলীগ ভাইদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন যথাক্রমে মাওলানা সালেহ আহমদ মুরব্বী সিলসিলাহ্‌, মাওলানা বশীরুর রহমান মুরব্বী সিলসিলাহ্‌। রাত ১০.৪৫মিঃ পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।

দ্বিতীয় অধিবেশন (রোজ শনিবার) সকাল ৯.০০টা হতে দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ শরীফ, মোয়াল্লেম, উর্দূ নযম পাঠ করে শুনান জনাব এস, এম, ইব্রাহীম; 'মালী কুরবানী' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব এ, কে, রেজাউল করীম, সেক্রেটারী উমরে আমা; 'নামাযের গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক মুরব্বী, সিলসিলাহ্‌। নযম (বাংলা) পাঠ করে শুনান জনাব শের আলী, দেহাতি মোয়াল্লেম; 'এতায়াতে নেযাম' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলীল সেক্রেটারী তালীম ও তরবীয়ত। বাংলা নযম পাঠ করেন শুনান জনাব নাদির হুসেন। অতঃপর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, বক্তব্য প্রদান করার মাধ্যমে ২য় অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দুপুরের খাবারের পর যোহর ও আসর নামায জমা করা হয়।

বিকাল ৩.০০টা হতে সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত অধিবেশন চলে। অধিবেশনে সভাপতিত্ব

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর-এর ২০তম সালানা জলসায় অংশগ্রহণকারী মেহমানগণের অংশ বিশেষ।

করেন আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কামরুল ইসলাম প্রধান, মোয়াল্লেম; নযম (উর্দূ) পাঠ করে শুনান জনাব শরীফ আহমদ; 'খাতামান্নাবীঈন' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা বশীরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্। বাংলা নযম পাঠ করে শুনান জনাব ইব্রায়েতুল হাসান 'ইমাম মাহ্দী (আঃ) -এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্,; 'দায়ী ইলাল্লাহ্' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২; নযম পাঠ করে শুনান জনাব পানাউল্লাহ্ মীর-পুরী অতঃপর সভাপতি আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর সাহেব অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বক্তব্য প্রদান করেন ও সমাপ্তি দোয়া করান। এ জলসায় উত্তরবঙ্গের ২৪টি জামাতসহ বাংলাদেশের সুদূর সন্দরবন, বি.বাড়ীয়া, তারুয়া সহ বিভিন্ন জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ যোগদান করেন। জলসায় উপস্থিতিঃ আনসার ৫৩৫ জন, খোদ্দাম ৪২৭ জন, আতফাল ৩৮৬ জন, লাজনা ৬২৬ জন, নাসেরাত ৫৮৩ জন, মোট ২৫৫৬ জন।

- মহিউদ্দীন আহমদ
সেক্রেটারী জলসা কমিটি

বৃহত্তর সিলেট জেলার ইসলামগঞ্জ, বীরগাঁও, সিলেট সদর, পাগুলিয়া, বড়চর, বড়গাঁও, জামালপুর, চাঁদপুর-চন্ডিছড়া জামাত পরিদর্শন

মোকাররম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে গত ২১-২৬ মার্চ, ২০০২ ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের এডিঃ কায়েদ উমুমী এবং কায়েদ তাজনীদ জনাব মাহবুব আজম রেজা ও কায়েদ তবলীগ জনাব আজিজুল হক সুনামগঞ্জ জেলার ইসলামগঞ্জ ও বীরগাঁও, সিলেট সদর, মৌলবীবাজার জেলার পাগুলিয়া, হবিগঞ্জ জেলার বড়চর, বড়গাঁও, জামালপুর ও চাঁদপুর-চন্ডিছড়া চা-বাগান জামাত পরিদর্শন করে জামাতের তা'লীম-তরবিয়ত, তবলীগ, আর্থিক ও অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয়ে উল্লিখিত জামাতগুলিতে দিক-নির্দেশনা দিয়ে আলোচনা করেন। এসকল জামাতের প্রেসিডেন্ট, আনসারুল্লাহ্র যয়ীম, খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ, সাধারণ সদস্যবৃন্দ, লাজনা ইমাইল্লাহ্র কর্মকর্তাগণ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের আন্তরিক আতিথেয়তা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, ঢাকা থেকে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য জনাব শাহ নজির এবং ইসলামগঞ্জ জামাতের প্রেসিডেন্ট ডাঃ রহুল আমীন প্রতিনিধিদের সাথে থেকে উক্ত পরিদর্শনে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন, যাজাহুমুল্লাহ্। প্রতিনিধিবৃন্দ উল্লিখিত জামাত ও মজলিসগুলিকে যেভাবে জামাতের কার্যক্রমে বিশেষ করে জামাতের তা'লীম-তরবিয়ত, তবলীগ, আর্থিক ও অন্যান্য সাংগঠনিক দিকসমূহ সম্পর্কে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে এসেছেন সেভাবে যেন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে তার জন্য পুনরায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

- মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরার তা'লীম ও তরবীয়তী ক্লাস ২০০২ইং অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরার তা'লীম ও তরবীয়তী ক্লাস, অত্র জামাতের মোয়াল্লেম মৌঃ মোঃ আসাদুল্লাহ্ আসাদ সাহেবের প্রশিক্ষণে গত ০৯/০৩/২০০২ইং হতে ২৭/০৩/২০০২ইং পর্যন্ত যথাযথভাবে পালন করেছে। ক্লাসে প্রতিদিন ১০/১২ জন আনসার হাজির থাকতেন।

তরবীয়তী ক্লাসে নামায শুদ্ধ করে পড়া, আচরণ, নবী রসূলগণের শিক্ষা, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর শিক্ষা ও জামাতী বই-পুস্তক পাঠ করার পরামর্শ ও. খলীফাগণের আচরণ-বিধি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ আলোচনা হয়।

- খলিলুর রহমান,যয়ীম
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ঘাটুরা

পঁচিশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সুভ্যেনীর প্রকাশ

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ এর পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ইজতেমা ২০০২ (রজত জয়ন্তী) সময় একটি সুভ্যেনীর প্রকাশ করবে ইনশাআল্লাহ্। এতে ইসলাম, আহমদীয়ত আনসারুল্লাহ্ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ ও ছবি ছাপা হবে। উপরোক্ত বিষয়ে আনসারদের কাছ থেকে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে যা ৩০শে জুন, ২০০২-এর মধ্যে খাকসারের নিকট অবশ্যই পৌছাতে হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলার সদস্য, স্থানীয় যয়ীম-এ আলা / যয়ীম, বিভাগীয় ও জেলা নাযেমদের পাসপোর্ট সাইজের ছবিও ঐ তারিখে মধ্যে পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- নির্বাহী সম্পাদক
আনসারুল্লাহ্ বুলেটিন

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর

খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রূপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

পাক্ষিক আহমদীর

অব্যাহত অগ্রযাত্রায়

আমাদের

অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য

যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

New Vol. No. 64 ❑ 19th Issue April 15, 2002 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly The AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

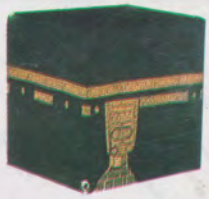

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com